মতামত ও লেখা পাঠানো সহ
সমস্ত ধরণের যোগাযোগ:

সম্পাদক
শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
১১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯
ফোন : ৯৪৩৩২৪২৪৯৮
(বৃহস্পতিবার, ১১- ২ টো)

শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

ভিতরের পাতায়

● রিজওয়ানুর হত্যা প্রসঙ্গে
● ভারতে খাদ্যসংকট ও মার্কিন সহযোগিতায় দ্বিতীয় কৃষিবিপ্লব
● এস.ই.জেড বিরোধী কনভেনশন
● শেয়ার বাজারের উর্দ্ধগতি

৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা নভেম্বর ২০০৭ বিনিময় : ২ টাকা

সিপিএম-এর বর্বর হামলায়

আবার রক্তাক্ত নন্দীগ্রাম

সাংবাদিকদের ঢুকতে বাধা

বিশেষ প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামে 'নতুন সূর্যোদয়ের' নামে সিপিআই(এম) আবার ফ্যাসিস্ত আক্রমণ নামিয়ে আনলো। গোটা রাজ্যের সশস্ত্র গুন্ডা-ডাকাত জড়ো করে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষ খুন করলো, জ্বালিয়ে দিলো বাড়িঘর। গণধর্ষণের শিকার হলো বহু নারী। হাজার হাজার মানুষ নতুন করে গৃহহারা হলো। ১৪ মার্চের পুলিশী নৃশংসতায় পর ফের নন্দীগ্রামে বইলো রক্তের বন্যা! নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় সি পি আই (এম) নেতা বিনয় কোঙার চারিদিকে ঘিরে ধরে 'লাইফ হেল' করার যে কথা বলেছিলেন, নভেম্বর মাসে গোটা রাজ্যবাসী তা প্রত্যক্ষ করলো। নন্দীগ্রামে সি পি আই (এম) দলের পরিকল্পিত বর্বরতার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে গোটা রাজ্য প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উত্তাল। বস্তুত এই ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলন বামফ্রন্টের গত ত্রিশ বছরের শাসনে দেখা যায়নি। শুধু এ রাজ্যে নয়, প্রতিবাদের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য রাজ্যেও। প্রশ্ন উঠেছে, কেন সি পি আই (এম) এই ধরনের বর্বরতার পথ বেছে নিল? পাশাপাশি একটা প্রচারও জোরদারভাবে করা হচ্ছে যে নন্দীগ্রামে 'দুপক্ষের' সংঘর্ষ হচ্ছে। এমনকি অনেকেই যারা এই নন্দীগ্রামে সিপিআই(এম) দলের বর্বরতার বিরুদ্ধে মুখর তারাও এই প্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছে। প্রশ্ন আসে নন্দীগ্রামের লড়াই কি সি. পি. আই (এম) বনাম তৃণমূলের এরপর ৫ পৃষ্ঠায় ☛

বাইক বাহিনীর তান্ডব

জেলায় জেলায়

রেশন বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েকমাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছে, খবরের কাগজগুলো যার নাম দিয়েছে—"বাংলার রেশন রোষ"। সাধারণ মানুষের অভিযোগ তারা দীর্ঘদিন ধরে রেশনে গম পাচ্ছেন না। চিনি, তেল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ডিলাররা যত মাল তোলেন তার একটা বড় অংশ গোপনে খোলাবাজারে বিক্রি করে দেন। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের প্রথম বিস্ফোরণ হয় বাঁকুড়ার সোনামুখীতে রেশন ডিলারের ওপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এর পরেই তা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদীয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে। রেশন দুর্নীতি নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রসঙ্গে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী পরেশ অধিকারী বলেছেন, এই ক্ষোভ ও হিংসাত্মক ঘটনার পেছনে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সমাজ-বিরোধী ও হতাশাগ্রস্থ বিরোধী রাজনীতিকদের হাত রয়েছে। প্রধান শাসকদল সিপিএম-এর প্রথম সারির নেতারা সমস্বরে বলতে শুরু করেছেন যে 'এটা হলো পশ্চিমবঙ্গের গণ-বণ্টন ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়ার একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত'। এই পরিস্থিতিতে, 'শ্রমিকশক্তি' পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা বর্ধমান এবং বীরভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমীক্ষা করি তা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা

বর্ধমান 'আপনারা কি রেশনে চাল-গম ঠিকমতো পান?' প্রশ্ন শুনেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গনেশ নাগ, জাহাঙ্গীর তফাদার, সমীর দে, নিশীথ দত্তরা। কথা হচ্ছিল বর্ধমানের দিকনগরের হাটকীর্তিনগর এলাকায় এক মন্দির চাতালে বসে। তাঁরা জানালেন, এলাকার প্রায় ৪০ শতাংশ লোকের রেশনকার্ড ডিলার নিজের কাজে বিভিন্ন অজুহাতে দীর্ঘদিন ধরে জমা রেখে দিয়েছেন। এই সমস্ত লোকেদের জানাই নেই যে তাদের কার্ড এপিএল না বিপিএল নাকি অন্তোদ্যয়। কার্ড ছাড়াই তাঁরা রেশন দোকানে যান এবং ডিলার দয়া করে যা দেয় নিয়ে ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। যাদের হাতে কার্ড আছে তাদেরও প্রায় একই অবস্থা। তেল, গম, চিনি নিয়মিত দেওয়া হয় না। দিলেও পরিমাণে কম

এরপর ৩ পৃষ্ঠায় ☛

পাঞ্জাবে জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের রায়

নতুন মাত্রা পেল জমির লড়াই

বিশেষ প্রতিবেদন: স্থান-কাল-সরকারের রঙের সামান্য রকমফের। পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুরের বদলে পাঞ্জাবের চকগুজরাল। ২০০৬-এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের টাটা মোটরসের জন্য জমি অধিগ্রহণ আর এই ২০০৭-এ পাঞ্জাবের অকালি দল-বিজেপি সরকারের ইন্টারন্যাশনাল ট্রাক্টরস লিঃ (ITL) কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণ—অদ্ভুত সব সাদৃশ্য একাকার করে দিচ্ছে শাসকদের নানা মুখগুলোকে। পাঞ্জাব সরকারের এই জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়টি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বার্তা নিয়ে আসছে। সুপ্রীম কোর্ট ITL-এ 'গনেশ প্রজেক্ট'-এর জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করেছে। শুধু তাই নয়, ১৮৯৪-এর 'জমি অধিগ্রহণ আইন' -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বেশ কিছু নতুন দিকও এনে হাজির করেছে সুপ্রীম কোর্ট।

ITL ফ্রান্সের রেনোঁ এগ্রিকালচার-এর সাথে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ট্রাক্টর সরবরাহের এক চুক্তি করেছে। এই রেনোঁ এগ্রিকালচার আবার ITL-এর ২০% শেয়ারের মালিক। পাঞ্জাব সরকার চকগুজরাল গ্রামে ঐ জমি অধিগ্রহণের যে নোটিশ জারি করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে এই কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে সেখানকার জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সূচিত হবে ..... অতঃপর এই অধিগ্রহণ 'জনস্বার্থে' করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই চেনা শব্দবন্ধ। ক্লিশে হয়ে যাওয়া যুক্তিগুলোর বিরামহীন পুনরাবৃত্তি। শাসকদলগুলো যে শিক্ষাটা নেয়নি, সুপ্রীম কোর্ট কিন্তু গত এক বছর ধরে ভারতবর্ষ জুড়ে বেড়ে চলা জমিরক্ষার লড়াইগুলো থেকে সেই শিক্ষাটা ঠিক খুঁজে নিয়েছে। তারা বুঝেছে যে 'জনস্বার্থ' বলে ব্যাক্তিপুঁজির হাতে জমি তুলে দেওয়ার অপযুক্তিটা পাবলিক আর খাচ্ছে না! ব্যক্তি পুঁজি ব্যবসা করবে মুনাফা করার জন্য, দানছত্র চালানোর জন্য নয়—এটুকু বোঝার জন্য অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠও জরুরী নয়, মালিকী স্বার্থের ঠুলি চোখে না লাগালেই এটা দিব্যি বোঝা যায়। বিগত পর্যায় জুড়ে চলা গণআন্দোলনগুলো প্রশ্ন তুলেছে আরও অনেক—কৃষিজমি লুণ্ঠণ প্রসঙ্গে, ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে, বিকল্প জীবিকা প্রসঙ্গে আলোড়িত হয়েছেন সমাজের বিদ্বৎজনেরাও।

এরকম একটা পর্যায়ে এসে সুপ্রীম কোর্টের রায়টা নজিরবিহীন। ১৮৯৪-এর জমি অধিগ্রহণ আইনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের ঐ বেঞ্চ বলছে—"যখন কোনো রাজ্যের সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে এগোবে, তখন অবশ্যই এই মতামত সুস্পষ্টভাবে উঠে আসতে হবে যে ঐ জমিগুলো 'ভালো কৃষিজমি' নয়। অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনে এই নীতিমালাই বিধৃত রয়েছে যা রাজ্য সরকারগুলোকে মেনে চলতে হবে।"

এই রায়ে আরো বলা হল যে, "কোনো জমির উৎপাদনক্ষমতা যদি ঐ অঞ্চলের গড় কৃষিজ উৎপাদনশীলতার (অঞ্চলের ফসল বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে) সমান হয়, যদি তাতে বাগান বা বাগিচা থাকে, তবে তাকে 'ভালো কৃষিজমি' বলা হবে।"

গন আন্দোলনের চাপ সুপ্রীম কোর্টকে নতুন করে 'ভালো কৃষিজমি' বা 'জমি অধিগ্রহণ আইন'-এর ব্যাখ্যা হাজির করতে বাধ্য করেছে। আর তার ফলে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই লড়াই যদি তীব্রতর হয় তবেই সুপ্রীম কোর্টের এই রায় কার্যকরীভাবে প্রয়োগ হবে। আর তা না হলে 'পুনর্মুষিক ভব' ... ঔপনিবেশিক কালাকানুন জমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ আবার তার নখ-দাঁত বের করবে,

এরপর ৬ পৃষ্ঠায় ☛

নন্দীগ্রামে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ

কলকাতায় ঐতিহাসিক জনস্রোত

মিছিলের শুরুটা যখন ধর্মতলায় পৌঁছেছে, শেষটা কলেজ স্কোয়ার ছেড়ে বেরোতে তখনও ঢের দেরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : নন্দীগ্রামের আবারো ঘৃণ্য গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং নন্দীগ্রামের আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে গত ১৪ই নভেম্বর কলকাতার রাজপথে নামলো মানুষের ঢল। আবার একবার কলকাতা সাক্ষী হয়ে থাকলো তার প্রতিবাদের চিরন্তন ঐতিহ্যের। দল-মত নির্বিশেষে কোন সংগঠনের ব্যানার ছাড়া এই মিছিলে কত মানুষ পা মিলিয়েছিলেন তার হিসেব দেওয়া মুশকিল। পুলিশের হিসেবে সংখ্যাটা ৬০,০০০। নির্দ্বিধায় বলা যায় সংখ্যাটা তার থেকেও বেশি।

বিগত একটা পর্যায়জুড়ে এবং বিশেষত গত কয়েকদিন যাবৎ নন্দীগ্রাম গণহত্যা সহ সামগ্রিকভাবে কৃষিজমি জবরদখল, সেজ গঠন, মালিকী স্বার্থে উন্নয়ন-শিল্পায়নের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। প্রতিবাদ যত বেড়েছে, ততই বেড়েছে আন্দোলন দমন করতে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষকরা ছাড়াও এই গোটা পর্যায় জুড়ে কখনও ছাত্রছাত্রী, মেহনতী মানুষ, কখনও মানবাধিকার কর্মী, রাজনৈতিক কর্মী-সংগঠক থেকে শুরু করে সাধারণ প্রতিবাদী মানুষদের ওপর নেমে এসেছে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন। ছাড় পাননি বুদ্ধিজীবীরাও। এই সময়ে গণহত্যা চালিয়েও যে সরকার নন্দন চত্বরে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চালাতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিতে শিল্পী-সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পীরা সামিল হলে তাদের ওপরেও নেমে আসে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন। ১৪ই নভেম্বরের মিছিল এই সমস্ত অংশের মানুষকে এক অসাধারণ মিছিলে একজোট করেছে। আর তাই সেদিন মিছিলে থমকে যাওয়া কলকাতার মুখে কোন বিরক্তি ছিল না, ছিল প্রতিবাদের দৃপ্ত শপথ। গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে।

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ✪ নভেম্বর ২০০৭

রেশন দুর্নীতি রুখতে প্রয়োজন সঠিক দিশায় সংগঠিত আন্দোলন

রাজ্যের ঘুনধরা, আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এতদিনে মানুষ কিছুটা সরব হয়েছেন। এই পর্যায়ে মানুষের বিক্ষোভগুলি হয়েছে প্রধানত রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় কমবেশি বিক্ষোভ হয়েছে—এখনও হচ্ছে। রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে মানুষের নানান অভিযোগ। অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয় যোজনার চাল বেমালুম মেরে দেওয়া, বিপিএল কার্ডধারীদের কার্ড নিজের কাছে রেখে ইচ্ছেমতো মাল দেওয়া বা না দেওয়া, এপিএল-দের প্রাপ্য গম না দেওয়া, গ্রাহকদের প্রাপ্য মাল পরিমাণে কম দেওয়া —এরকম হাজার একটা অভিযোগ। কিছু কিছু রেশন ডিলার তাদের সম্পত্তি যেভাবে বছর কয়েকে বাড়িয়ে নিয়েছেন তা পুকুরচুরি ছাড়া সম্ভব নয়। দু-একটি জায়গায় মানুষের ক্ষোভ স্থানীয় সিপিএম নেতাদের বিরুদ্ধেও আছড়ে পড়েছে। খুবই স্বাভাবিক। কারণ কে না জানে শাসকদলের মদত ছাড়া রেশন ডিলাররা এত বাড় বাড়তে পারত না। আর সিপিএম-এর বহু নেতাই যে চুরির মালের বখরা নেয় তাও বিভিন্ন জায়গায় মানুষের আজ কোন অজানা বিষয় নয়। তবে শুধু সিপিএম নয়, অন্যান্য দলের নেতারাও যে কেউ কেউ এই দুর্নীতিচক্রের সঙ্গে যুক্ত তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। তবে গোটা রাজ্যে সিপিএম দল হিসাবে এবং তার নেতারা যেভাবে এই দুর্নীতিচক্রের অংশীদার হয়ে পড়েছেন তা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসী আমলকেও লজ্জা দেয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে যে আগেও রেশন ডিলাররা চুরি করত। কিন্তু তা এখনকার মতো এমন পুকুরচুরি নয়। এই পুকুরচুরির অন্যতম কারণ রেশন ডিলারদের বিভিন্ন জায়গায় চুরির বখরা দিতে হয়। সবচেয়ে বড় বখরা দিতে হয় সিপিএম নেতাদের। বখরা দিতে হয় এফসিআই-র ভিন্ন মাপের কর্তাদের।

বর্তমান পর্যায়ে, বিভিন্ন জায়গায় সে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে তার বর্শামুখ রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে। বেশ কয়েকজন রেশন ডিলার তো আতঙ্কে, অপমানে আত্মহত্যা করেছেন বলেও শোনা যাচ্ছে। মানুষ কাছে যাকে পায় তাকেই পাকড়াও করে। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে সেটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে দুর্নীতি শুধু রেশন ডিলাররা করে না। আরও বড় দুর্নীতি করে বড় বড় রাঘব বোয়ালেরা। তাদেরকে ছেড়ে দিলে চলবে না। খাদ্যমন্ত্রীই বা পার পেয়ে যাবেন কোন অজুহাতে? গোটা রাজ্যে যখন রেশন ব্যবস্থা নিয়ে আগুন জ্বলছে তখন কি ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছেন?

তাছাড়া প্রশ্নটা শুধু দুর্নীতির নয়। প্রশ্নটা সরকারের গোটা গণবন্টন ব্যবস্থা নিয়েই গরীব মানুষের খাদ্যের অভাব মেটানোর যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে গণবন্টন ব্যবস্থা চলার কথা সেটাকে জলাঞ্জলি দিয়ে গোটা গণবন্টন ব্যবস্থাটিই চালিত হয়েছে কিছু বড় বড় ভূস্বামীর ফেলে দেওয়া খাদ্যশস্য কেনা এবং তা নিয়ে নানারকম চুরি জোচ্চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে। রেশন ডিলারদের দূর্নীতিরও উৎস এই ত্রুটিপূর্ণ কেন্দ্রীয় গণবন্টন ব্যবস্থা। রেশনব্যবস্থাকে গুরুত্বহীন ও দূর্নীতিগ্রস্ত করে দেওয়ার প্রশ্নে কেন্দ্র রাজ্য সব সরকারই সমান। রাজ্যসরকার তো রাজ্যের প্রাপ্য রেশনের খাদ্যশস্যও পুরো তোলে না, এমন কথাও জানা যাচ্ছে। আর দূর্নীতির প্রশ্নে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে কোন অংশে কম নয়।

আসলে কেন্দ্র হোক রাজ্য হোক এই মালিকী শাসনব্যবস্থায় কোন সরকারই মানুষের সুস্থভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকার করে না। তাই প্রতিটি মানুষকে প্রায়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করার যে দায় সরকারের থাকে তা কেন্দ্র-রাজ্য কেউ-ই পালন করে না। বড়লোকেদের খাদ্যের সমস্যা নেই—আছে অতিখাদ্যের সমস্যা। সমস্যাটা গরীব লোকেদের। সরকার গরীব লোকেদের নানারকম শ্রেণীবিভাগ করেছে। সেই অনুযায়ী নানারকম রেশনকার্ড ও নানারকম বরাদ্দ—এপিএল, বিপিএল, অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয়। কোন কার্ডে কী বরাদ্দ তা প্রায়শঃই সাধারণ মানুষের জানাবোঝার বাইরে থাকে। যারা জানে বোঝে তাদের মুখ বন্ধ করে রাখলেই সব ল্যাটা চুকে যায়। একদিকে গোটা রেশনব্যবস্থাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দেওয়া, অন্যদিকে নানান কায়দায় হরেক রকমের দূর্নীতির বন্দোবস্ত করে রাখা, এটিই সরকারের বর্তমান গণবন্টন নীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গী।

তাই সাম্প্রতিককালে রেশন ব্যবস্থার দূর্নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় যে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে পরিপূর্ণ গণআন্দোলনের রূপ দেওয়া আজ অত্যন্ত জরুরী। এই আন্দোলন যাতে শুধু রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ না থেকে সরকারের জনবিরোধী গণবন্টন নীতির বিরুদ্ধে এবং মন্ত্রী-আমলা-শাসকদল সহ সর্বস্তরের দূর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় সেদিকেও আমাদের সচেতন প্রয়াস চালাতে হবে। শুধু রেশন ডিলারদের দূর্নীতি বন্ধ করার দাবি নয় আমাদের দাবি তুলতে হবে এই ত্রুটিপূর্ণ ডিলার ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে সরকারি কাউন্টার থেকে সরকারি বেতনভূক কর্মচারীদের মাধ্যমে রেশন বিলি করা হোক। আমাদের দাবি তুলতে হবে রেশন ব্যবস্থাকে ক্রমশ দুর্বল না করে আরও শক্তিশালী করা হোক। একটি পরিবারের প্রয়োজনীয় পুরো খাদ্যশস্য, কেরোসিন, চিনি ইত্যাদি রেশনে সরবরাহ করা হোক। কোনো এলাকায় কোটার ভিত্তিতে বিপিএল কার্ড নয় সমস্ত গরীব মানুষকে বিপিএলভূক্ত করতে হবে। বন্ধ কারখানার শ্রমিক, ক্ষেতমজুর এদের বিপিএল হিসাবে অবশ্যই নথিভুক্ত করতে হবে। দূর্নীতির প্রশ্নেও আমাদের বিভিন্ন উচ্চপদস্ত আমলা, পার্টিনেতা, জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী ইত্যাদিদের দূর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হতে হবে।

দীর্ঘদিন পর পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলনের এক চমৎকার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, রিজওয়ানের মৃত্যু ইত্যাদিকে ঘিরে দিকে দিকে মানুষ সরব হয়েছেন। সেই সময়েই রেশন দূর্নীতির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ পশ্চিমবাংলায় মেকি বামদের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে এবং মানুষকে সক্রিয় করেছে। এই পরিস্থিতিকে একটি বিপ্লবী দিশায় একটি সংগঠিত গণআন্দোলনের ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রনী শ্রমিকদের অগ্রনী ভূমিকা আজ সময়ের দাবি। অন্যথায় এইসব আন্দোলন শাসকশ্রেণীরই সংসদীয় রাজনীতির ভুল ভুলাইয়ায় হারিয়ে যাবে।

যে মৃত্যু ক্রমশঃ হিমালয়ের চেয়েও ভারী হয়ে উঠছে

রিজওয়ানুর হত্যা প্রসঙ্গে

শঙ্কর দাস

যাবতীয় দায় সারা
শুধু তোমার বেদীর কাছে রেখে দিয়ে
একগোছা ফুল কিংবা মালা
যে রীতি আমাদের নয়।

সেই উত্তাল ষাট-সত্তরে প্রিয় সহযোদ্ধাদের শহীদ-বেদীতে কোনো অখ্যাত তরুণ কবির এইরকম কোনো কবিতার লাইন যাহা কাগজে লটকে দেওয়া হতো। সাধারণ মৃত্যু আর হত্যাগুলো বুদ্ধ ভট্টাচার্য কথিত 'মানি পাওয়ার'-এর ধ্বজাধারীদের কাছে ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠত আর চারিদিকে উঁচু বা নিচু গলায় উচ্চারিত হতো কান্নাভেজা হাজারো শপথবাক্য। তাই লড়াই বেঁচে ছিল, বেঁচে আছে। আর আজ এই ২০০৭ সালে রিজওয়ানুরের মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলী সেই দিনগুলির কথাও যে তুলে আনল তারও নিশ্চয়ই কারণ আছে।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সর্বশেষ যে পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে তা এইরকম, প্রবল জনমতের চাপে পড়ে বুদ্ধ ভট্টাচার্যের সরকার পুলিশ কমিশনারসহ লালবাজারের উচ্চপদস্থ পাঁচজন অফিসারের বদলি করেছেন। নতুন পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সিবিআই-এর তদন্ত চলছেও। প্রিয়াঙ্কা তোদির বাবা লাক্স কোজি কোম্পানির মালিক শ্রীমান অশোক তোদি সিবিআই-এর কাছে স্বীকারও করেছেন যে মেয়েকে ফিরে পেতে তিনি মরিয়া ছিলেন। সেইজন্য শুধু যে যাগযজ্ঞই করেছেন এমন নয়, তার সঙ্গে পয়সা দিয়ে গুণ্ডা-মাস্তান, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশের বড়-মেজো-সেজো সমস্ত কর্তা এমনকি রিজওয়ানুরের পরিবারের সদস্যদের—এককথায় এই ঘটনায় আইনী ও বেআইনী পথে ভূমিকা রাখতে পারেন এমন সকল চরিত্রকেই হাত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রিজওয়ানুর আত্মহত্যা করেছেন, এটা প্রতিষ্ঠা করার একটা চাপা চেষ্টা সিবিআই-এর তদন্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উচ্চকোটির মানুষরা একজোট—সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ

আসুন দেখি, কি ঘটল গোড়া থেকে। বড়লোক বাড়ির মেয়ে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমান ঘরের ছেলে রিজওয়ানুরের বিয়ে ভেঙে দিতে তৎপর হলেন বাবা শ্রীমান অশোক তোদি। বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতা থেকে পুলিশ কমিশনার, ব্যবসায়িক পার্টনার—উচ্চকোটির সকল মানুষরা নিমেষেই জুটে গেলেন তার দিকে। অত্যন্ত দ্রুত একজন অন্যজনের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে ফেললেন এবং গড়ে তুললেন একটা গোটা চক্র। শুরু হয়ে গেল রিজওয়ানুর-প্রিয়াঙ্কার ওপর প্রবল চাপ। রিজওয়ানুরের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ ভট্টাচার্য স্বীকার করেছিলেন, 'মানি পাওয়ার কাজ করেছে', সঙ্গে এও বলেছিলেন যে ব্যপারটাতে একটা 'সাম্প্রদায়িক রং'-ও আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় মানুষ জানেন যে রিজওয়ানুর যদি দরিদ্র্য ব্রাহ্মণের ছেলেও হতেন তাহলেও এমন ঘটনাই ঘটত। বড়লোক ঘরের সন্তান না হওয়াটা ছিল তার প্রথম অপরাধ। গরীব কোনো ছেলে বড়লোক বাড়ির কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম বা বিয়ে করলে মেয়ের বাড়ি থেকে প্রথমেই যেটা বলা হয় তা হলো এই যে, ছেলে পয়সার জন্যই এমন করেছে। আসলে কোটি কোটি গরীব মধ্যবিত্ত-সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন ঠকিয়ে যে বিপুল সম্পদ উচ্চকোটির মানুষরা তাদের হাতে জমা করেছেন তার এক অতি সামান্য অংশও যেন এমনকি বিবাহসূত্রেও নিম্নশ্রেণীর কারুর হাতে গিয়ে না পড়ে তার জন্য সবসময়ই তাদের অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি থাকে। সুতরাং প্রস্তাব আসতে থাকে। কিছু পয়সা নাও—মেয়েকে ছেড়ে দাও। শ্রীমান তোদিও তাই করেছেন। রিজওয়ানুরের বাড়িতে গিয়ে সাদা চেক ফেলে দিয়ে বলেছেন—যা ইচ্ছে নিয়ে নাও, মেয়েকে ছেড়ে দাও। সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির মানুষদের কাছে মেয়েরাও একপ্রকার সম্পত্তি বিশেষ। সম্পত্তিহীন মুসলমান ঘরে সেই সম্পত্তির হস্তান্তরও আটকাতে হবে, তাই টেবিলে ফেলে দিলেন খোলা চেক। তিনি ভালো করেই জানেন যে, গরীব-সাধারণ মানুষ যদি আত্মসম্মান বিজর্সন দেয় তাহলেও তার খুব বেশি চাওয়ার ক্ষমতা থাকে না। কত আর লিখবে চেকে। দশ-বিশ লাখ! ওতো তার মোট সম্পত্তির এক অংশও হবে না। বিয়ে টিকে গেলে তো চলে যাবে সবটাই। শাস্ত্রে বলেছে, সর্বনাশ সামনে এসে দাঁড়ালে পণ্ডিত লোকরা এমনকি অর্ধেকও ত্যাগ করেন। আর সম্পত্তি-বুদ্ধিতে শ্রীমান তোদি তো পণ্ডিত বটেই!

সেখানে ঠিক সুবিধা করতে না পেরে এবার তিনি ছুটলেন তার শ্রেণীভ্রাতাদের কাছে। শ্রেণীস্বার্থের একই মানসিকতা তাদের কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে দিল। তার ওপর তাদের সমাজের রীতি মেনে কাঁচা পয়সা ছড়ানোও শুরু হলো। একে অন্যকে ঘুষ দিয়ে কিনে ফেললেন। রিজওয়ানুরকে আটকাতেই হবে। ব্যাটা একে গরিব তায় মুসলমান! হ্যাঁ, রিজওয়ানুরের দ্বিতীয় অপরাধ ছিলো তিনি ছিলেন মুসলমান। 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই মহান দেশে এখনও জাতপাত ধর্ম নিয়ে সংস্কারই টিঁকে আছে তা নয়, ক্ষমতার বিভাজনও দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমানরা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবেই এখানে নানারকম বঞ্চনার শিকার—দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। শ্রীমান তোদির জামাই হওয়ার চেষ্টা তো তাদের কাছে এক স্পর্ধা বিশেষ। সুতরাং পাইক বরকন্দাজ ছুটল তিলজলার বস্তিতে। উচ্চকোটির মানুষদের এই মিলিত জোট আর তাদের পোষা রাষ্ট্রশক্তির সমবেত আক্রমণের সঙ্গে শুরু হলো অসম যুদ্ধ। রিজওয়ানুর যোগাযোগ করেন মানবাধিকার সংগঠন এ.পি.ডি.আর-এর সঙ্গে। ধীরে ধীরে শুরু হতে থাকে পাল্টা লড়াই। কিন্তু লড়াই শুরু হবার মুখেই হঠাৎ করে খুন হলেন রিজওয়ানুর। হ্যাঁ, বর্তমান লেখকের দৃঢ় ধারণা রিজওয়ানুর খুন-ই হয়েছেন। যতই এটিকে 'আত্মহত্যা' বলে চালানোর চেষ্টা করা হোক না কেন। আর তাছাড়া, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় এটি 'আত্মহত্যা', তবুও, তার পেছনে 'প্ররোচনা' যে যথেষ্টই ছিল, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের আইনে, আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দেওয়া খুন এরই নামান্তর।

সিবিআই তদন্ত কি দিতে পারে?

এরপরে আমরা দেখলাম যে প্রবল জনমতের ধাক্কায় সরকার পুলিশ কমিশনার পাঁচজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তার বদলি করলেন। যদিও উচিত ছিলো রিজওয়ানুরকে হত্যার অভিযোগে তাদের জেলে বন্দী করা। প্রতিবাদী জনতার এক অংশ এবং কিছু রাজনৈতিক দল সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছিল। হাইকোর্টও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং সাময়িকভাবে পিঠ বাঁচায় বুদ্ধ ভট্টাচার্য। কিন্তু সিবিআই তদন্ত আমাদের কি দিতে পারে? আমাদের পূর্ব আলোচিত বড়লোকদের পোষা রাষ্ট্রশক্তির একটি অংশতো সিবিআই-ও বটে। সিবিআই কি পারবে প্রকৃত দোষীকে সনাক্ত করতে, শাস্তি দিতে? সিবিআই-তো তদন্ত শুরু করেছিল শ্রীমান তোদির বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে। তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? গরীব মানুষদের তো পুলিশ কারণে অকারণে ছোটখাট কেস্ দিয়েও গ্রেপ্তার করে। তাহলে শ্রীমান তোদি এখনও জেলের বাইরে কি যুক্তিতে? আর যদি শেষপর্যন্ত তিনি দোষী সাব্যস্তও হন, সঙ্গে ধরা যাক জসবন্ত কি অজয় কুমার, তাহলেই কি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি আমরা? কি হবে মুখ্যন্ত্রীর মুখ ফসকে বেরিয়ে আসা সেই 'মানি পাওয়ার'-এর? সিবিআই নিশ্চয়ই বলবে না, যে সমাজে একচেটিয়া পুঁজির দাপাদাপি চলে, যেখানে অধিকাংশ সম্পদ জমা হয় সামান্য কিছু সংখ্যক লোকের হাতে, সেখানেই তার কাজ করে চলে মানি পাওয়ার। সিবিআই নিশ্চয়ই একচেটিয়া পুঁজিকে গ্রেপ্তার করবে না, উচ্ছেদ করবে না। সিবিআই নিশ্চয়ই বলবে না যে, যদি অপরাধী ধরাও পড়ে, তার শাস্তিও হয় তাহলেও তা আংশিক মাত্র, চূড়ান্ত নয়। রিজওয়ানুর পর্ব মিটে গেলে আমরাও দুরুদুরু বুকে অপেক্ষায় থাকব পরের রিজওয়ানুরের জন্য আর খবর পেলে অফিস-ফেরতা পার্কস্ট্রীটের ফুটপাতে আমরা মোমবাতি জ্বালাব!

শেষের কথা—প্রতিবাদের দীপশিখা দাবানল হোক

আনন্দবাজার বলছে, দেখো তো কি দারুণ! কোনো পার্টি নেই, ঝাণ্ডা নেই, মতাদর্শ নেই। নেই কোনো রাজনীতি। বড়লোকরা এক নিমেষে জোটবদ্ধ হয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে গরীব মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়াস নেই। নেই সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলার বস্তাপচা বুলি। হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ জানিয়ে শুধু মোমবাতি জ্বালিয়ে যাচ্ছে। আর তার জোরেই কেমন 'ভেঙে পড়ল রাজশক্তি'। পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত অপসারিত হলেন। তাহলে এবার থেকে যেন শুধু এই হয়। অন্যায় চলবে আর প্রতিবাদও চলবে। দু-এটা বলির পাঁঠার বিনিময়ে সাময়িক ধাক্কা থেকে বারবার বেঁচে যাক বড়লোকদের হাতের রাজদণ্ড। সেফটি ভালভ ছাড়া কি প্রেসার কুকার হয়?

ষাট-সত্তরের উত্তাল গণআন্দোলনের মহত্ব দিলো এইখানে যে তা শুধু প্রতিবাদেই শেষ হয়ে যায়নি। একচেটিয়া ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে এক দৃপ্ত মতাদর্শে বলীয়ান হয়ে তা এক নতুন সমাজ গঠনে ব্রতী হয়েছিল। ব্রতী হয়েছিল গরীব মানুষের রাজ কায়েমে। আর আজ যখন ষাট-সত্তরের শিক্ষাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, লড়াইকে আটকানো যাচ্ছে না দেখে লড়াইকে নিরাপদ বৃত্তে গণ্ডীবদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে তখন সজোরে আমাদের সেই শিক্ষাকেই তুলে ধরতে হবে। নতুন করে ঘোষণা করতে হবে আমাদের রীতি ও পদ্ধতি। পুরনো শপথগুলি নতুন দিনে নতুনভাবে উচ্চারিত হোক। শহীদের রক্ত ব্যর্থ হবে না। রিজওয়ানুরের মৃত্যু ক্রমশঃ হিমালয়ের চেয়েও ভারী হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদের দীপশিখা কি দাবানল হয়ে উঠবে না?

ভারতের খাদ্যসঙ্কট ও মার্কিন সহযোগিতায় দ্বিতীয় কৃষিবিপ্লব

সুমন্ত দাস

সম্প্রতি সমীক্ষায় প্রকাশ ভারতের খাদ্যভাণ্ডার কমছে, অর্থাৎ খাদ্যসঙ্কট বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬-০৭ বর্ষে ৩৫ লক্ষ টন গম ভারতকে আমদানী করতে হয়েছিল। পরের বছরের (২০০৭-০৮) জন্য অঙ্কটা হলো ৫০ লক্ষ টন। অঙ্কের হিসেবটা সামান্য কমলেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতবর্ষের খাদ্য নিরাপত্তা যে যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীন তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গমের উৎপাদন তো বাড়ছেই না বরং প্রবণতাটা কমার দিকে। ১৯৯৯-২০০০ বর্ষে গমের উৎপাদনের হার ছিল প্রতি হেক্টর জমিতে ২৭.৭৮ কুইন্টাল। ২০০৬-০৭ সালে অঙ্কটা কমে দাঁড়িয়েছে ২৬.১৭-এ। ১৯৯৯-২০০০ সালে গমের মোট উৎপাদনে ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন আর ২০০৬-০৭ বর্ষে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টন-এ। গমের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ কমছে, অন্যদিকে বীজ ও সারের দাম বাড়ছে। কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ ১৯৯৮-৯৯ সালের তুলনায় ২০০৬-০৭ সালে ২০ লক্ষ হেক্টর কমে গেছে। অবস্থাটা এমন উদ্বেগজনক যে প্রধানমন্ত্র স্বয়ং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং শষ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবার আওয়াজ উঠেছে সরকারের তরফ থেকে।

বর্তমান নথিভুক্ত হিসেব অনুযায়ীই দেশের মানুষের এক-তৃতীয়াংশই অর্ধভুক্ত বা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। ২০০৬-০৭ বর্ষে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ ছিল ২২ কোটি টন কিন্তু বাস্তবে উৎপাদন হয়েছে বড়জোর ২০ কোটি ৯ লক্ষ টনের কাছাকাছি। এসব কিছুর ফলশ্রুতিতেই ৭টি রাজ্যের দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলের বহু মানুষ অনাহারে এবং অনুষ্ঠিতে মৃত্যুর কবলে পতিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রায় ১১০ কোটি জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানের জন্য আগামী ১৫ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে। বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার হলো ১.৬ শতাংশ আর প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির হার হল ৪.৭ শতাংশ।

কৃষির সঙ্কটের এই আশংকাজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতসরকার চিন্তিত। অভুক্ত মানুষের মিছিল যে কোনও সময় বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ-এর মিছিলে পরিণত হতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা সরকারের ঝানু রাজনীতিবিদরা ভালোভাবেই জানেন। প্রধানমন্ত্রী তাই কৃষিক্ষেত্রে ২৫ হাজার কোটি টাকার সাহায্য ও একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। এইগুলি অবশ্য সত্যিই কতখানি খাদ্য সংকটকে প্রশমিত করার জন্য আর কতখানি জনরোষকে প্রশমিত করার জন্য সেই নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ভারত সরকার তথাকথিত দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের প্রস্তুতি নিয়েছেন। আর এই সবুজবিপ্লব সফল করার জন্য মার্কিন কর্তাদের আশ্রয় নিয়েছেন ভারত সরকার। সরকার সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত-মার্কিন Knowledge Initiative on Agricultural Education (KIA) নামে এক বিতর্কিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। মার্কিন তরফে এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময় মার্কিন বেসরকারি সংস্থা মোসান্টো ও ওয়ালমার্টের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য ব্যাপারটিকে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়েছেন। এই সবুজ বিপ্লব অবশ্য পুরোপুরি বেসরকারি প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। চুক্তির মূল বিষয় হলো ভারতের জৈবপ্রযুক্তির ভাণ্ডারে মার্কিন কৃষিপ্রযুক্তির অনুপ্রবেশ, এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকারে (Intellectual Property Rights– IPR) আক্রমণ। এর মূল বিষয় হলো কৃষিজ বংশগতি দ্বারা পরিমার্জিত (Genetically modefied) কৃষি ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু করা।

বিজ্ঞানীরা এই চুক্তিকে বিরোধিতা করেছেন এই কারণে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর জৈব প্রযুক্তির জন্য অবশ্য প্রয়াজনীয় কৃষিজ বংশগতির রসদ নেই। এবং এই চুক্তি (কেআইএ) ভারতে কৃষিজ বংশগতির ভাণ্ডারে মার্কিন ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি বল্গাহীন অনুপ্রবেশ ঘটাবে, এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান কৃষিজ বংশগতির বৈচিত্রে থাবা বসাবে। এই কৃষিজ বংশগতির সম্পদ-এর বিনিময়ে মার্কিনীদের কাছ থেকে কি পাওয়া যাবে বা কিভাবে তা পাওয়া যাবে তা পরিষ্কার নয়। বিজ্ঞানীরা এও আশংকা করেছেন বিনিময় এবং যৌথ গবেষণার মাধ্যমে ভারতের মহামূল্যবান যোণিকা কোষ দেশের বাইরে চলে যাবে।

কৃষিবিজ্ঞানীরা এর বিরোধিতা করছেন বিশেষত এই কারণে কৃষিজ বংশগতি পরিমার্জিত শষ্য সমূহ নিরাপদ কিনা তা প্রমাণিত হয়নি। সম্ভাব্য স্বাস্থ্যহানি ছাড়াও জমি ও শষ্য দূষিত হয়ে পড়তে পারে। বিজ্ঞানীরা এও উল্লেখ করেছেন যে কৃষিজ বংশগতি পরিমার্জিত শস্য যে খাদ্যশষ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে, এমন কোনও প্রমাণ নেই।

যদিও রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) কৃষি কমিশন যতক্ষণ না পর্যন্ত জৈব নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ বংশগতি পরিমার্জিত শস্যের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেছেন। তা সত্ত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় এর প্রয়োগ ঘটেছে, এবং এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ রাজ্যসরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জৈব নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন এখনও পর্যন্ত চালু করেনি। যে দল ভারত মার্কিন পারমানবিক চুক্তির বিরাধিতা করে, সেই দলের সরকার শাষিত রাজ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী কৃষিব্যবস্থা কিভাবে লাগু হলো—এই ব্যাপারে বিস্ময় এর অবকাশ নেই। কারণ মার্কিন সংস্থা ওয়ালমার্ট-এর সঙ্গে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। বুদ্ধবাবুকে মার্কিন সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সম্প্রতি মার্কিন অর্থসচিব হেনরি পলসন বুদ্ধদেবের পিঠ চাপড়ে গেছেন। অবশ্য এর জন্য পুঁজিপতিদের সেবায় কৃষক হত্যায় হাত পাকিয়ে নিতে হয়েছে বুদ্ধদেবকে।

সংসদীয় বামেরা ১২৩ চুক্তি নিয়ে বাজার গরম করলেও কেআইএ চুক্তি নিয়ে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করছে। চুক্তিটি করা হয়েছে সংসদ তথা সংশ্লিষ্ট সব মহল-এর মতামত-এর তোয়াক্কা না করেই, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স এবং ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থা তথা কৃষক সংগঠন সবাইকেই উপেক্ষা করে।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি কমিশন-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আর.এন বসু উল্লেখ করেছেন চুক্তিটি কোনও বিতর্ক বা প্রচার-এর অবকাশ না রেখেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োগ শুরু করা হয়েছে। হায়দ্রাবাদস্থিত সেন্টার ফর সাস্টেইনেবল্ এগ্রিকালচার-এর দুই বিজ্ঞানী গুষ্টর জিভি রমজেনেইল্যু এবং শ্রীমতি কবিতা কুরুগান্তী প্রধানমন্ত্রীর কাছে ৪ সেপ্টেম্বর লিখিত এক প্রকাশ্য পত্রে কেআইএ-এ চুক্তির বাস্তবায়ন বন্ধ রাখা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কৃষি অর্থনীতিবিদ ডক্টর সুমন সবাই উল্লেখ করেছেন পারমানবিক চুক্তিতে কিছু ছাড় পাওয়ার বিনিময়ে কৃষিতে ভারতকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিস্বীকার করতে হতে পারে কেআইএ চুক্তি মোতাবেক।

এতবড় একটা বিপজ্জনক চুক্তি চালু হয়ে গেল অথচ দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির কোনও তাপ উত্তাপ লক্ষ্য করা গেল না। সীতারাম ইয়েচুরী, প্রকাশ কারাত প্রমুখরা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি চড়ে গিয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে সোনিয়া মনমোহন-এর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা থেকে পর্যন্ত বিরত থাকলেন। আরএসপি-নেতা তথা রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতিগোস্বামী বলেছেন 'আমাদের কৃষিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির ব্যাপারে আমাদের সাংসদরা কি নিদ্রিত ছিলেন?' পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের সংস্কৃতির আফিম্ খেয়ে যারা সংসদে যান তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে যদি নিদ্রিত থাকার পথটাকেই যদি বেছে নেন, তবে এর মধ্যে আর আশ্চর্যের কি আছে ক্ষিতিবাবু!

তথ্যসূত্র —

(1) Dwindlingfood—Y. P. Gupta Statesman, 3-1-07

(2) Deal with USA Could Threaten food Security— Anindita Chowdhury, Statesman 19-10-07

☛ ১ পৃষ্ঠার পর

জেলায় জেলায় রেশন বিক্ষোভ

দেওয়া হয়। রেশনে জিনিস ঠিকমতো না দেওয়া, বিপিএল কার্ড নিয়ে দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে ২০০৪ সালে এখানে এক তীব্র গণআন্দোলন বেড়ে উঠেছিল। পুলিশ সেই আন্দোলনে ক্ষেতমজুরদের ওপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে চোখ নষ্ট হয়ে যায় ছবি বাউরি নামে এক ক্ষেতমজুরের। তার স্বামী ছান্দা বাউরির পাঁজরে এখনও পুলিশের গুলি ঢুকে আছে। তবে সেই গণআন্দোলনের ধাক্কায় বর্ধমানের এই আউসগ্রাম অঞ্চলে রেশন ডিলাররা মানুষকে একেবারে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু গত ১১ মাস ধরে এপিএল কার্ডে যে গম দেওয়ার কথা ছিল তা জানতেনই না সাধারণ মানুষ বা অন্য কেউ। রেশন ডিলাররা কখনোই কার কি প্রাপ্য তা রেশন দোকানে প্রকাশ্যে লিখে টাঙিয়ে দেন না। যদিও সরকারি নিয়ম সেইরকমই। রেশন-ডিলারদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা 'গণবন্টন দুর্নীতি প্রতিরোধ মঞ্চ' গড়ে তুলে লড়াই তীব্র করার দিকে এগিয়ে চলেছেন। এমকেপি সংগঠনের সদস্য 'গণবন্টন দুর্নীতি প্রতিরোধ মঞ্চ'-এর আহ্বায়ক গোপাল পাল বলেন, গ্রামের প্রতি বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে ২০০০ সালে 'লোকদীপ', 'কুটির জ্যোতি' প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রকল্প এখন বিশবাঁও জলে। রেশনে কেরোসিন তেলও পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না। বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানো কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর কথার সমর্থন পাওয়া গেল রাস্তার পাশে এক মাঠের প্রান্তে বসে থাকা গণেশ মাঝি, সদাই মেটে, সনৎ মেটেদের কাছ থেকে। রেশনিং নিয়ে প্রশ্ন করতে তাঁরা বললেন, আরে ডিলাররা তো ভয় পেয়ে এখন মিউচুয়াল করতে চাইছে। চুরির মাল তারা ফেরৎ দেবে বলেছে। কিন্তু আমাদের এখন অনেক বড় লড়াই করতে হবে সরকারের বিরুদ্ধে। এপিএল, বিপিএল নিয়ে এখানে প্রচুর দুর্নীতি আছে। শাসকদলের ঘনিষ্ঠ লোকেদের ৫-৭ বিঘা জমি থাকা সত্ত্বেও সবার কাছে বিপিএল কার্ড আছে। অথচ যাদের ঐ কার্ড পাবার কথা তারা পাচ্ছেন না। মানুষের হাতে পয়সা নেই যে খোলাবাজার থেকে বেশি দাম দিয়ে জিনিস কিনবেন। সরকার ১০০ দিনের কর্মদিনের প্রকল্প ঘোষণা করলেও সবাই সেই কাজ পায়নি। কিছুলোক মাত্র পাঁচ-ছয় দিনের কাজ পেয়েছে। তাদের কাছ থেকেই শোনা গেল ১০০ দিনের কর্মপ্রকল্প নিয়ে সরকারি অব্যবস্থার চরম নিদর্শনের এক উদাহরণ। ঐ গ্রামেই পাঁচ বিঘা জমির ওপর একটা পুকুর কাটার জন্য প্রায় চারহাজার লোককে ঠেসাঠেসি করে কাজে লাগিয়ে দেয় প্রশাসন। খেঁসাঘেসি পা-এর মধ্যে কোদাল চালাতে গিয়ে একজনের পা-ই কাটা যায় সেই অব্যস্থায়। দু-বেলা মোটা ভাত কাপরের জোগাড় করতে গিয়ে মানুষ নাকানি চোবানি খাচ্ছেন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন একদল খেতমজুর। চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন—মাটি তাতছে লড়াই হবে।

বীরভূম বীরভূমের ভবানন্দপুর, লাভপুর, রাজনগরসহ বিভিন্ন এলাকায় রেশন ডিলাররা জনতার ক্ষোভের মুখে পড়েন। লাভপুর থানা এলাকায় লাঙ্গলহাটায় ১ অক্টোবর তারিখে গ্রামবাসীরা বিডিও অফিস ঘিরে বিক্ষোভ জানায়। বন্যার সময় কোনো সাহায্য না পাওয়া, রেশনে জিনিস নিয়মিত না পাওয়া, পরিমাণে কম দেওয়া এই সমস্ত অভিযোগে গ্রামবাসীদের তরফ থেকে বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সেখানকার বিধানসভার প্রার্থী দেবাশিষ ওঝা জানান ঐ দিন বিডিও-র আহ্বানে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে মিটিং শুরু হয়ে যায়। বারোটা নাগাদ বাইরে অপেক্ষারত জনতা চীৎকার করে জানতে চায়, আমাদের জানান কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। দীর্ঘক্ষন ধরে কোনো জবাব না পেয়ে তারা ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। একসময়ে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বিডিও অফিসের জেনারেটর ঘরে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ কোনোভাবে সতর্ক না করেই গুলি চালাতে থাকে। আয়ুব শেখ নামে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এরপর শুরু হয় পুলিশ-র‍্যাফের তাণ্ডব। সর্বত্র তারা জনতাকে আক্রমণ করে। বিডিও অফিসে বিরোধী দলের লোকজনদের র‍্যাফের মাঝখানে ফেলে এস ডি ও তাদের পেটাতে বলেন। দেবাশিষ ওঝার হাত ভেঙে দেওয়া হয়। আয়ুব সেখের পাড়ার লোকজন বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরেই কিছু পাচ্ছি না। বারো হাজার কার্ড আর একজন ডিলার। তাও আবার রেশন দেওয়া হয় সপ্তাহে একদিন, যেখানে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে ন্যুনতম পাঁচদিন রেশন দেওয়ার কথা। বিরাট লাইন পড়ে। ডিলার সুধীর মণ্ডল গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য কুখ্যাত। তাদের কাছ থেকেই জানা গেল মানুষ চিনি, তেল, গম না পেলেও পার্টিনেতা এবং তাদের আত্মীয়রা বাড়ির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় যথেষ্ট মাল-পত্তর ডিলারদের থেকে নিয়ে যায়। ডিলাররা শাসকপার্টির বিভিন্ন সম্মেলনে হাজার হাজার টাকা চাঁদা দেয়। বিনা পয়সায় মালপত্তর দেয়। বিনিময়ে ভোগ করে অবাধ দুর্নীতির অনুমতি।

লাঙলহাটার মতো একই অবস্থা কুডুচ্চা অঞ্চলেও। ৩০ অক্টোবর রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে সমস্ত গ্রামবাসীরা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। ডিলারের ঘরে মজুদ চাল, গমের বস্তা ছিনিয়ে নেয় গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশ এসে ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়। বিমল সাহার ভাইপো বিশ্বজিৎ সাহা বলেন—পাঁচজনকে পুলিশ লাঙ্গলহাটার কেসের সঙ্গে জড়িয়ে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ প্রশাসন পুরোপুরি ডিলারদের পক্ষ নিয়েছে। সঙ্গে জুটেছে শাসক পার্টি। আমাদের সকলের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। লাভপুর, নামার, মিয়ানেও একই পরিস্থিতি। রেশন ব্যবস্থায় বঞ্চনার শিকার হয়ে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভে ফেটে পড়লে এখানেও জনতার সাথে পুলিশ এবং শাসকপার্টির লোকেদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। একদিকে পুলিসি সন্ত্রাস আর অন্যদিকে শাসক পার্টির হামলার মুখে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত লড়াই এবার সংগঠিত চেহারা নিতে শুরু করেছে।

বিমান বসু বলেছেন—'গণবন্টন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার এক পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে'। আর বীরভূমের মানুষ জবাব দিয়েছেন—'আরে গণবন্টন ব্যবস্থাটাই তো নেই। কাকে ধ্বংস করা হবে?' বর্ধমান জেলার সিপিআই(এম) পার্টির সেক্রেটারী অমল হালদার বলেছেন— 'বিরোধীদের চক্রান্ত'। আর আউসগ্রামের ক্ষেতমজুররা বলছেন—'পার্টিনেতাদের মদতে ডিলারদের ব্যাপক দুর্নীতি।' কে ঠিক বলছেন তা বিচার করার ভার আমরা পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই মানুষ রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সেখানেই রেশন ডিলাররা স্বীকার করেছেন যে, হ্যাঁ তাঁরা দুর্নীতি করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা যে মাল চুরি করেছেন তা ধাপে ধাপে গ্রামের মানুষকে ফেরৎ দেওয়ার অঙ্গীকারও করেছেন। বীরভূম জেলার যোলপুর শহরে সিপিএম(এল) (এসওসি) নেতা শৈলেন মিশ্র তাদের পার্টিকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্যাডে লেখা একটি চিঠির কপি আমাদের হাতে দিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জনৈক নিখিল কুমার দালাল তাদের লিখে জানিয়েছেন যে তারা গত ১১ মাস ধরে এপিএল কার্ডের যে মালপত্তর চুরি করেছেন তা ধাপে ধাপে গ্রামবাসীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বর্ধমানের দিগনগরেও দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারদের চুরির খেসারৎ দিতে বাধ্য করেছেন গ্রামবাসীরা। এরপরেও বুদ্ধ-বিমানরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন।

গত তিরিশ বছর ধরে গণবন্টন ব্যবসায় নামে রাজ্যে তারা যে ব্যাপক ধোঁকাবাজী আর দুর্নীতি চালিয়ে আবেদন তা এখন লোকের চোখে ধরা পড়ে গেছে। মানুষ লড়াইয়ের রাস্তায় নেমে পড়েছেন। এখন বিপ্লবী শক্তিগুলি এই লড়াইকে এক সত্যিকারের গণমুখী গণবন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াইয়ে পরিণত করতে পারে কি না সেটাই দেখার।

এম কে পি-র ডাকে
এস ই জেড-বিরোধী সর্বভারতীয় কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যব্যাপী ব্যাপক প্রচারের মধ্যে দিয়ে গত ১ ও ২ অক্টোবর মজদুর ক্রান্তি পরিষদের ডাকে দু'দিনব্যাপী সর্বভারতীয় কন্‌ভেনশন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মহাজাতি সদনে। প্রথম দিনের বিষয় ছিল 'সেজ'-বিরোধী আন্দোলনের সর্বভারতীয় অভিজ্ঞতা। বিনানন্দ ঝা, আভাস মুন্সি, অমিতাভ ভট্টাচার্য ও অমৃত পৈড়াকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলি উক্ত বিষয়ে একটি প্রস্তাব সভায় লিখিতভাবে পেশ করে। প্রস্তাবের উপর ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য সভায় পেশ করেন মজদুর ক্রান্তি পরিষদের সভাপতি বিনানন্দ ঝা।

আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে প্রস্তাবের উপর প্রথম বক্তব্য রাখেন মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার 'সেজ'-বিরোধী সংগঠন, মহামুম্বাই শ্বেতকারী সংঘর্ষ সমিতির পক্ষে মুম্বাই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী কোল্‌সে পাতিল। তিনি বলেন যে আজ পর্যন্ত আমরা বহু অন্যায় সহ্য করে নিয়েছি। এদেশের ডান-বাম 'নেতা'রা আজ আমাদের জল-জঙ্গল-জমি-খনিজ সম্পদ পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দিতে চাইছে। এটা মানা যায় না। এই 'সেজ' আইন '০৫ আমাদের দেশের সংবিধান বিরোধী। কেননা এই আইন সংবিধানের মূল চারটি স্তম্ভ সার্বভৌমত্ব, সমাজবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে লঙ্ঘন করেছে। বর্তমান সংবিধানে যেটুকু অধিকার গরিব মানুষের আছে তাকে অগ্রাহ্য করছে এদেশের রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারগুলি, বিচার বিভাগ ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতারা। নানাভাবে সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারগুলি বে-আইনী কাজ করে চলেছে। এই নিয়ে তাঁরা মুম্বাই হাইকোর্টে প্রশ্ন তুলেছেন। তাই সরকার এখন বলছে, জমি পুঁজিপতিরা নিজেরাই সংগ্রহ করুক। আর প্রয়োজনে কৃষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে জমি আদায় করে দিতে পুঁজিপতিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে পুলিশ। শ্রী পাতিল আরো বলেন যে, মহারাষ্ট্র সরকার আম্বানিদের রিলায়েন্স কোম্পানিকে ৪৫ হাজার একর জমি দেবে বলেছিল। কিন্তু ব্যাপক আন্দোলনের ফলে গত দেড় বছরে এক ইঞ্চি জমিও তারা দিতে পারেনি। সবশেষে তিনি সভায় বলেন যে, রাষ্ট্র এখন আর কল্যাণকারী নয়, নেতারাও পুঁজিপতিদের পকেটে। তাই পুঁজিপতিরা আজ এত আক্রমণাত্মক। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে নেতৃত্ব করার সংকীর্ণ ভাবনা ত্যাগ করে, সমস্ত বিবাদ ভুলে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে সংগ্রামরত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোই আজ অন্যতম প্রধান কাজ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি বলেন যে, ২০০৫ সালে লোকসভায় 'সেজ' বিল পাশ হয়। ২০০৬ সালে 'সেজ' আইনের রুলিং পাশ করানো হয়। কিন্তু ২০০৩ সালেই বাম সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় 'সেজ' বিল পাশ করায়। অর্থাৎ লাল-তেরঙ্গা-গেরুয়া সব রঙের রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে এই সেজ আইন প্রয়োগ করতে মাঠে নেমেছে। কৃষক জনতা কিন্তু এই আক্রমণ বুঝতে ভুল করেনি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 'সেজ' বিরোধী সংগ্রামে কৃষক জনতা নেমেছে। '৪২-এর স্বাধীন সরকার গঠন, মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মবলিদান, তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহ্যে পুষ্ট নন্দীগ্রামের মানুষ আজ আবার লড়াই-এ নেমেছে। শ্রী চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ১৯৭৩ সালের মন্দার পর বিশ্বের বৃহৎ পুঁজিপতিরা নতুন পথ খুঁজতে থাকে। তাদের এই নতুন পথ হোল ডবলিউ টি ও-এর মাধ্যম গোটা বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখল কায়েম করা। এরই প্রচলিত নাম বিশ্বায়ন। এই বিশ্বায়নের ফলে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের সবচাইতে ধনী ২০ শতাংশ মানুষ সবচাইতে গরিব ২০ শতাংশ মানুষের ১০০ গুন বেশি সম্পদশালী হবে। পরিশেষে দীপঙ্করবাবু বলেন, আমরা যদি সংগ্রামের ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দিতে পারি, কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে পারি তাহলে নতুন করে এক স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হতে পারে।

উড়িষ্যা থেকে আগত রাজেন্দ্র সারঙ্গি বলেন যে কাশিপুরে বিগত ১৩ বছর ধরে বিস্থাপন বিরোধী সংগ্রাম চলছে। ২০০৬ সালে উড়িষ্যার বিজেপি-বিজেডি সরকার কলিঙ্গনগরে গুলি চালিয়ে কৃষক হত্যা করেছে। কিন্তু তখন থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে বন্ধ। পনেরোটি জায়গায় পুলিশ-প্রশাসন ঢুকতে পারছে না। যেন মুক্তাঞ্চল। জাল স্টাম্প পেপার কেলেঙ্কারির নায়ক হর্ষদ মেহেতার সাথে সম্পর্কিত কুখ্যাত অনিল আগড়ওয়াল লাঞ্জিগড়ে বিশাল জমির উপর বেদান্ত নামক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ছে, যেখানে নাকি তৈরি হবে নোবেল বিজয়ী, অলিম্পিক জয়ী, দেশনেতা, কর্পোরেট পার্সোনালিটি। উড়িষ্যার জগৎসিংপুরে বহুজাতিক পস্কো এখন পর্যন্ত এক ইঞ্চি জমি নিতে পারেনি। পস্কোর ম্যানেজার ৩০০ জন মোটরসাইকেলবাহী গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে হামলা চালাচ্ছে আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্য। 'সেজ' গঠনের আগেই যদি এই রকম আচরণ শুরু করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো, তাহলে সেজ স্থাপন হলে কি ভয়াবহ অবস্থা হবে সহজেই অনুমেয়। তামিলনাড়ু উপকূলে 'সেতুসমুদ্রম' প্রকল্প হলে যে হাজার হাজার জেলে তাদের জীবিকা থেকে উৎখাত হবে তা কেউ উল্লেখ করছে না। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার গত ১১ জুন ২০০৭, এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে পশ্চিমী দেশগুলোর মতো কৃষকদের উচ্ছেদ না করলে এদেশের কৃষির উন্নতি হবে না। এর অর্থ হোল আগামী ১০-১৫ বছরে সরকার কোটি কোটি কৃষককে উচ্ছেদ করতে চলেছে। তিনি কৃষকদের এককাট্টা করতে ও মধ্যশ্রেণীর মানুষদের আন্দোলনের পক্ষে টেনে আনতে কাজ করার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বক্তব্য পেশ করেন।

উড়িষ্যার জগৎসিংপুর জেলায় পস্কো তথা 'সেজ'-বিরোধী সংগ্রামের সংগঠক ও যুবভারত (উড়িষ্যার) নেতৃত্বদায়ী কর্মী অক্ষয় সভায় বক্তৃতা রাখেন। তিনি বলেন 'সেজ' বিরোধী লড়াই আসলে এদেশের জল-জমি-জঙ্গল বাঁচানোরই সংগ্রাম। শিল্পায়ন্নয়নের নামে এশিয়ার সব চাইতে বড় বক্সাইট, ক্রোমিয়াম, আয়রণের ভাণ্ডারকে লুঠতে চাইছে মিত্তাল, পস্কো, টাটারা। পারাদ্বীপ বন্দর থাকতেও প্রাইভেট বন্দর গড়তে চাইছে পস্কো। চাইছে ক্যাপটিভ মাইন ও 'সেজ', যা ইতিমধ্যেই উড়িষ্যা সরকার অনুমোদন করেছে। সরকার সব জমি পস্কো কোম্পানিকে লিখে দিলেও ব্যাপক গণ আন্দোলনের কারণে এক ইঞ্চি জমি পস্কো নিতে পারেনি। তিনি বলেন যে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের সংগ্রামের পর বহু শক্তিই 'সেজ'-বিরোধিতার কথা বলছে। আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিনা তা বুঝতে হবে। আর আমাদের বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভাবনা না থাকলে আমরা লড়াই জিতেও হেরে যাবো। তাঁর মতে, বিকল্প চিন্তা নিয়ে ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম-দের মতো আত্মবলিদান দিয়ে ও একমন-একমত নিয়ে আমাদের সংগ্রামের পক্ষে কাজ করে যেতে হবে; তবেই আমরা জয়যুক্ত হব।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মানবাধীকার আন্দোলনের কর্মী ও এপিডিআর সংগঠনের সংগঠক সুজাত ভদ্র বলেন যে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (১২০) স্ট্যান্ডার্ড-এ বলা আছে— কৃষকদের কোন অবস্থাতেই উচ্ছেদ করা যাবে না; যদি একান্ত উচ্ছেদ করতেই হয় তবে কৃষকদের বিকল্প জমি দিতে হবে। বিদেশের একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে একটি প্রকল্প স্থাপন করা নিয়ে কানাডার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে আন্দোলনকারীরা। সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে জন শুনানী, তর্ক-বিতর্কের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সেখানে জাতীয় স্তরে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, জন শুনানী হয় এবং পরিশেষে প্রকল্পটি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। তিনি বিভিন্ন রাজ্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের মামলাগুলি উল্লেখ করে দেখান যে বিচার বিভাগে জনস্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না, ফলে প্রতিষ্ঠিত দলগুলির দ্বারা পরিচালিত সরকারগুলিই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

ভূতপূর্ব ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের সচিব শ্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে ১৯৫০-২০০৪ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে গোটা ভারতে ছয় কোটি মানুষ জমি থেকে উৎখাত হয়েছেন যার ২৪ শতাংশ মানুষ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। আর উৎখাত হয়ে যাওয়া এই বিপুল সংখ্যক মানুষের শতকরা ৪০ শতাংশই আদিবাসী। তিনি প্রশ্ন তোলেন তোলেন, সিঙ্গুরে হাজার হাজার মানুষ সর্বস্ব হারালো আর এখানে কাজ পাবে কতিপয় মানুষ, তাহলে উন্নয়ন কাদের হোল? আর সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে বলে সিপিআই(এম) ১২৩ পরমাণু চুক্তির বিরোধীতা করছে অথচ 'সেজ'-এর নামে দেশের বৃহত্তম জমি কেলেঙ্কারী হতে চলেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজমি-জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক প্রদীপ ব্যানার্জি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে সেজ আইনের সংশোধন নয়, এই আইনকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন বৃহত্তর লড়াই। ৯০ শতাংশ মনুষকে একত্রিত ও সংগঠিত করা। ডান-বাম বিচার করলে হবে না, দেশপ্রেমই আসল। সবার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। সব বামপন্থীদেরই উৎকেন্দ্রীকতা ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে আমরা দেশপ্রেমী, তারপর আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। বক্তব্যের শেষে প্রদীপবাবু বলেন, প্রকৃত উন্নয়ন ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক একটি বিকল্প উন্নয়নের মডেল আমাদের হাজির করতে হবে যা দেশদ্রোহী বিকৃত উন্নয়নের মডেলের বিরুদ্ধে দেশকে বাঁচাতে সাহায্য করবে।

রায়গড়ের 'সেজ' বিরোধী সংগঠন, মুম্বাই শ্বেতকারী সংঘর্ষ সমিতির সংগঠক কর্মী শ্রী বিলাশ সোনওয়ানে বলেন যে 'সেজ' গঠনকে কেন্দ্র করে কর্মকাণ্ড প্রমাণ করছে যে আজকে ভারতীয় সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব জনগণের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের নয়, সাম্রাজ্যবাদের। পুঁজি যখন বিশ্বায়িত তখন কোন দেশের সার্বভৌমত্ব থাকে না। দুনিয়া এখন একটি গ্লোবাল ভিলেজ আর শ্রেণীও এখন বিশ্বায়িত। দীর্ঘ ভাষণে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ২০০৩ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গের বিধনসভায় 'সেজ' আইন পাশ হয় যায় তখন এখানকার সংগ্রামী বামেরা কি করছিলেন? তাঁর মতে, জমির আন্দোলন মানে সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম আজ আর নয়, এই আন্দোলন আসলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। নন্দীগ্রামের সংগ্রাম জনতার সংগ্রাম। আমরা তার সাথে আছি এটুকু বলা যায়। জমির আন্দোলনে যখন শাসক পার্টি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তখনও আমরা এগোতে পারছি না। আমরা জনতাকে অনুসরণ করছি মাত্র, নেতৃত্ব দিতে পারছি না। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আমরা নেই, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দল রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (এনজিও) দ্বারা সমর্থিত সিপিআই, সিপিএম-রা উৎখাত হয়ে যাওয়া কৃষকদের ক্ষতিপূরণের আওয়াজ তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। এনজিও ও পার্লামেন্টারি পার্টি ছাড়া সমস্ত আন্দোলনকারী, বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে একটি দেশব্যাপী মঞ্চ গড়ার আহ্বান জানিয়ে ও পেশ করা প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

শেষ আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক কুশল দেবনাথ। তিনি বলেন, 'সেজ' আইনের মূল উদ্দেশ্য হোল সাম্রাজ্যবাদের হাত শক্ত করা। পূর্বেকার সরকারগুলি যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তারই আইনসিদ্ধ রূপ দিতে এই 'সেজ' আইন। এটা উন্নয়নের কোন পথই নয় বরং মানুষ মারা এক ভয়ানক আইন। 'সেজের' আওতায় থাকা শ্রমিকরাই শুধু নয়, 'সেজ' এলাকার বাইরের শ্রমিকরাও কৃষক, আদিবাসীদের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কলকাতার নিকটস্থ ফলতা 'সেজ'-এ আগুন লাগার ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সেখানে শ্রমআইন কোনভাবে মানা হয় না। 'সেজ' আওতাভুক্ত শিল্পগুলিকে পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস-এর অন্তর্ভুক্ত করার ফলে আগাম নোটিশ ছাড়া ধর্মঘটের অধিকারও শ্রমিকদের থাকবে না। তিনি আরও বলেন যে, জুটশিল্পে কাংকারিয়া গোষ্ঠী সেসন জিরো প্রথা চালুর মাধ্যমে শিল্পের ৫৫ শতাংশ শ্রমিককে অস্থায়ী ও নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে তেমনি মালিকশ্রেণী আজ 'সেজ' গঠনের মাধ্যমে কম মজুরীতে শ্রমিক খাটাতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাঁর মতে, রায়গড়, জগৎসিংপুর, নন্দীগ্রাম সহ সমস্ত লড়াইকে একসূত্রে গাঁথতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে লড়াইগুলিকে সংগঠিত করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে কন্‌ভেনশন, আলোচনা সভা প্রভৃতির মাধ্যমে লড়াই-এর এক অনুকূল বাতাবরণ গড়ে তুলতে হবে।

সবশেষে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে আভাস মুন্সি আমন্ত্রিত বক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে বিভিন্ন মতের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এক বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে যা সংগ্রামের সহায়ক। নানা শক্তি এই ধরনের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে কাছাকাছি আসছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে মিলিত উদ্যোগের মধ্য দিয়েই সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে। তিনি ঘোষণা করেন যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সহই আজকের সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

২ অক্টোবর বেলা দশটায় কন্‌ভেনশনের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। দ্বিতীয় দিনের প্রস্তাবের বিষয় ছিল—সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় মিত্রদের স্বার্থে তৈরি 'সেজ' আইন ও অন্যান্য শোষণ নীতির বিরুদ্ধে লড়াই-এ ভারতের সংগ্রামী বামশক্তির কর্তব্য। প্রস্তাবের আলোচনা পেশ করেন অমিতাভ ভট্টাচার্য।

আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিউমঙ্গল সিদ্ধান্তকর (সিপিআইএম-এনপি) সোমনাথ চ্যাটার্জী (সিপিএমএল-এসওসি), অলিক চক্রবর্ত্তী (সিসিআরএমএল), মানিক মুখার্জী (এস ইউ সি আই), প্রদীপ সিংহ ঠাকুর (সিপিআইএমএল-এনডি)। মজদুর ক্রান্তি পরিষদের পক্ষে অমিতাভ ভট্টাচার্য প্রস্তাবের উপর প্রথমে বক্তব্য রাখেন। সিউমঙ্গল সিদ্ধান্তকর তাঁর ভাষণে বলেন, 'সেজ' ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের এক ভয়ঙ্কর হামলা। এর বিরুদ্ধে প্রতি-রোধের প্রস্তুতি নিতে হবে। বুর্জোয়ারা আজ দেশভক্তির কথা বলছে। বিদেশী টাকায় পুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন(এনজিও) গুলি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কথা বলছে। এই তথাকথিত দেশভক্তি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নয়া কৌশলে শোষণ-শাসন চালাতে সাম্রাজ্যবাদীরা কল্যাণকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আজকের অবস্থাকেও শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বুঝতে হবে এবং সমস্ত মেহনতী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই গড়ে তুলতে হবে। 'সেজ'বিরোধী সর্বভারতীয় মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে। কেবল 'সেজ' নয় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। পেশ করা প্রস্তাবের প্রতি সাধারণভাবে সমর্থন জানিয়ে সিদ্ধান্তকারজী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সিসিআরএমএল-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অলীক চক্রবর্ত্তী বলেন, 'সেজ' আসলে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন চেহারাকেই উন্মোচিত করছে। 'সেজ' আইন বাতিলের দাবি ও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার রক্ষা দাবির মধ্যেকার আন্ত-সম্পর্ককে বুঝতে হবে। জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষকে 'সেজ' তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। জনগণের আন্দোলনে কেবল যুক্ত হলেই হবে না, সংগ্রামী বামপন্থীদের উন্নত চিন্তা-চেতনা জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। কেবল জীবিকা বাঁচানোর সংগ্রাম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা যাবে না। এর সাথে চেতনার মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী চেতনা মতাদর্শের বিপরীতে সংগ্রামী বামপন্থার উন্নত বিকল্প চেতনার জন্ম দিতে হবে। তবেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সফলতার দিকে এগোতে পারবে। তাই উন্নত চেতনা সম্পন্ন শক্তির স্বাধীন প্রচারাভিযান গড়ে তুলতে পারা আজকের সময়ের কর্তব্য।

সোমনাথ চাটার্জী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সেজ' আইন গড়ার পর্যায়ে সংগ্রামী বামপন্থীরা যে ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে এই সমালোচনা সঠিক। তবে দেরীতে হলেও আমরা সচেতন হয়েছি। দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন কন্‌ভেনশন্‌ শুরু হয়েছে। তবে নন্দীগ্রামের মানুষ লড়াই করে ওখানে 'সেজ' তৈরির কার্যক্রমকে যে রুখে দিয়েছেন তা এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। জনসাধারণের এই সংগঠিত-ধারাবাহিক সংগ্রাম থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দুর্বলতা ও উত্তাল কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা শিক্ষাগ্রহণ করে। গ্যাট থেকে শুরু গরে ডবলিউ টি ও গড়ে তোলে। আবার শক্তি সঞ্চয় করে তারা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া চালু করে। ১৯৮০-এর শেষে এদেশে শুরু হোল প্রাইভেটাইজেশনের প্রক্রিয়া যার সাম্প্রতিকতম রূপ হোল 'সেজ', যা কিনা উপনিবেশে বানাবার এক নয়া সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। কিন্তু আজ সংগ্রামী বামপন্থীরা বিভাজিত। তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। সংগ্রামী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে বিরোধ মেটাতে আলাপ আলোচনা চালাতে হবে। আন্দোলনের স্বার্থে মঞ্চকে প্রসারিত করতে হবে। দক্ষিণপন্থী, সংসদীয় বামদলগুলিদের নিয়েও এই সংগ্রামী মঞ্চ গড়তে হবে। ছুৎমার্গ-এর পথ নিলে হবে না। সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তুলতে হলে অতীত ভুলে, মতপার্থক্য ভুলে সব বামপন্থী শক্তিকে একত্রিত হতে হবে। এছাড়া রাস্তা নেই।

তামিলনাড়ু থেকে আগত গণআন্দোলনের সংগঠক কর্মী ভিরাচামি বলেন, নন্দীগ্রাম একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে এটা ঠিক, কিন্তু সিপিএম অন্য কোন জায়গায় এই 'সেজ' গড়বে। গোটা দেশে শত শত 'সেজ' গড়ে উঠছে। সমস্ত মানুষকে এক করে 'সেজ' বিরোধী লড়াইগুলোকে নিয়ে একটা লড়াই গড়ে তুলবো কিভাবে তা আমাদের ভাবতে হবে। সংস্কারের পথে নয়, বিপ্লবী পথেই আমাদের এগোতে হবে। কেবল 'সেজ' বা রিটেল চেইন বা রিলায়েন্স-কোকাকোলা নয়; সবগুলোকে যুক্ত করে দেখতে হবে। পরাস্ত করতে হবে, রি-কলোনাইজেশনের প্রক্রিয়াকে। আজ আমাদের একদিকে আত্মসমালোচনা করতে হবে অন্যদিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এস ইউ আই-এর নেতা মানিক মুখার্জী বলেন, নন্দীগ্রামের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যেখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলে সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এগোতে পারে না। কারা আন্দোলনের শক্তি তা বুঝতে হবে; সবদিক বুঝে তবেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আজ সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তীব্র সঙ্কট। তৃতীয় বিশ্বের বাজার ধরবার জন্যই তারা নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করছে। ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তিকে হাতিয়ার করে আন্দোলনে বসতে হবে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলে গণকমিটি গড়ে কাজ করতে হবে। এই গণকমিটিগুলি যাতে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হয়ে না দাঁড়ায় তা দেখতে হবে।

সিপিআইএমএল(এনডি)-র পক্ষে প্রদীপ সিংহ ঠাকুর বলেন, আমাদের কর্তব্য হোল 'সেজ'-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে আসা। কিন্তু তা কীভাবে হবে তা নিয়ে বামশিবিরে মতভেদ আছে। গণআন্দোলন গুলিতে টিএমসি, এনজিও প্রভৃতির সাথে যাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক আছে। আন্দোলনের মধ্যে রুদ্ধদ্বারবাদী-বিলোপবাদী মনোভাবও আছে। সংগ্রামী বামশক্তি দুর্বল, তাদের মধ্যে ঐক্যও নেই। নন্দীগ্রামের আন্দোলনের পর সংগ্রামী বামপন্থীদের অবস্থান পাল্টানোর দরকার ছিল, কিন্তু তা হোল না। 'সেজ'বিরোধী আন্দোলন কিন্তু বিশুদ্ধ থাকবে না। বিভিন্ন আঁকাবাঁকা পথে এ সংগ্রাম চলবে। বামশক্তির দায়িত্ব এই আন্দোলনগুলিকে নেতৃত্ব দেওয়া। বামশক্তির দায় একটি মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলা। সংগ্রামী বামশক্তির মধ্যে যে ঐক্য আছে তাকে খুঁজে বার করে তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আমন্ত্রিত বক্তাদের বক্তব্য রাখার পর সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে অমৃত পৈড়া সভায় সমাপ্তিসূচক বক্তব্য রাখেন। ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই দু'দিন-ব্যাপী সেজ-বিরোধী কনভেনশন-এর সমাপ্তি হয়।

শেয়ার সূচকের ঊর্দ্ধগতি কি দেশের আর্থিক অগ্রগতির পরিচয়?

ইদানীং খবরের কাগজগুলোতে এক বিরাট সোরগোল শুরু হয়েছে। শেয়ার সূচক বা সেনসেক্সের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির কর্তাব্যক্তিরা থেকে শুরু করে খবরের কাগজের সম্পাদক পর্যন্ত সবাই মিলে দেশবাসীকে প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, এর মানে হলো দেশের উন্নতি, দেশের অর্থনীতির বিরাট শ্রীবৃদ্ধি। এই হারে এগোতে থাকলে ২০২০ সালের মধ্যে আমরা 'সুপার পাওয়ার' হয়ে উঠব। চারদিকে একটা উল্লাস এবং খুশীখুশী হাওয়া বইয়ে দেওয়ার ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়েছে। বিদর্ভে যে হাজার হাজার কৃষক আত্মঘাতী হলেন তাদের স্বজনরা কিংবা কাজ না পাওয়া শ্রমিকরা, দেশের যে সুবিপুল জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছেন তারা এবং যে বিরাট কর্মহীন বেকার বাহিনী তাদের সবাইকে দুঃখ ভুলে এখন নাকি দাঁত বার করে সর্বদা হাসতে হবে কারণ সেনসেক্স বাড়ছে। আমরা বিরাট উন্নতি করছি। তো এই স্বর্গীয় আনন্দঘন মুহূর্তে আসুন আমরা দেখি সত্যিই কি শেয়ার সূচকের বৃদ্ধি আমাদের দেশের আর্থিক প্রগতি সূচিত করে না কি তা দেখায় অন্যকিছু?

গত ২৯ অক্টোবর তারিখে মুম্বাই শেয়ার বাজারের যে সূচক, যা সেনসেক্স নামে পরিচিত তা ২০,০০০ পয়েন্ট স্পর্শ করে। আজ থেকে দেড় বছরের কিছুকাল আগে যখন সেনসেক্স ১০,০০০ পয়েন্ট স্পর্শ করেছিল তখনই অনেকের চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। আর গত দেড় বছরে বস্তুতপক্ষে সবাইকে কার্যত হতবাক করে সেনসেক্স ক্রমশঃ আরও উঠেছে এবং যে ১০,০০০ পয়েন্টে আসতে তার কুড়ি বছর সময় লেগেছিল, পরের ১০,০০০ অতিক্রম করতে অর্থাৎ সর্বমোট ২০,০০০ পয়েন্ট স্পর্শ করতে তার সময় লেগেছে মাত্র কুড়ি মাস। এখন প্রশ্ন হলো সেনসেক্স এইরকম রকেটের গতিতে বাড়ছে কেন? আসলে সেনসেক্স বাড়ছে তার প্রধান কারণ হলো বিপুল পরিমাণে বিদেশী বিনিয়োগ ভারতের বাজারে ঢুকছে। বাজারকে যদি আমরা এইভাবে ভাগ করি যে একটা হলো 'পণ্য ও পরিষেবার বাজার' এবং আর একটা হলো 'অর্থের বাজার' তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে পণ্য ও পরিষেবার বাজারে যে বিদেশী বিনিয়োগ আসে তা এফডিআই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্ট-মেন্ট) এবং অর্থের বাজারে যে বিদেশী বিনিয়োগ আসে তা এফআইআই (ফরেন ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টমেন্ট) নামে পরিচিত। ২০০৪ সালের পর থেকে ভারতের বাজারে এফডিআই এবং এফআইআই উভয়েই ঢুকছে হু-হু করে। এখন, সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের সংগ্রাম বা দেশব্যাপী 'সেজ' গঠনের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের লড়াই এবং সে সংক্রান্ত বিভিন্ন বিতর্ক ইতিমধ্যেই আমাদের কিছুটা শিখিয়েছে যে বিনিয়োগ বাড়লেই দেশের মানুষের সামগ্রিকভাবে বিরাট কিছু লাভ হয় না। লাভ হয় মুষ্টিমেয় কিছু দেশী-বিদেশী পুঁজিপতির। অর্থাৎ এফডিআই প্রচুর হারে বাড়লেও তা আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির কোনো সমাধান করতে তো পারবেই না বরং তা তাদের নতুন নতুন আক্রমণের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে। আরও তীব্র শোষণ এবং বল্গাহীন হামলা প্রচণ্ড তিক্ত এবং রক্তাক্ত লড়াইয়ের আবর্তেই তাদের টেনে নিয়ে যাবে। এই একই কথা পুরোপুরি খাটে এফআইআই-এর ক্ষেত্রেও। এফআইআই-এর এই প্রবল বৃদ্ধি বস্তুতপক্ষে কোন সমৃদ্ধি নয় বরং সূচিত করছে এক বিরাট অতল সংকট-কে।

না, কথাটা ঠিক বলা হলো না। যদি বলি সেনসেক্সের বৃদ্ধি বা ভারতের বাজারে এফআইআই-এর বৃদ্ধি কোনো সমৃদ্ধিকেই সূচিত করে না তাহলে কথাটা একটু ভুল হয়ে যাবে। আসলে তা অল্পকিছু সংখ্যক লোকের বিরাট সমৃদ্ধিতেই সূচিত করে। বাকি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে তিমিরে পড়েছিলেন সেই তিমিরেই থেকে যান। আজকাল এ কথা অনেকেরই জানা আছে যে দেশি-বিদেশি কোম্পানি গুলি যে বিপুল লাভ করে তার একটা বড় অংশই আসে শেয়ার বাজার থেকে। শেয়ার বাজার থেকে কি উপায়ে লাভ করা হয় তা বিস্তারিত আলোচনা আমরা এখন করব না। শুধু একটি উদাহরণ যা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে তার উল্লেখ করব। মুম্বাই শেয়ার বাজারের সূচক বা সেনসেক্স যেদিন ২০০০০ স্পর্শ করল তার কয়েক দিনের মধ্যেই রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির কর্তা মুকেশ আম্বানী বিশ্বের সবথেকে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি পেছনে ফেলে দিয়েছেন বিল্ গেট্স্, লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্তল সহ বিশ্বের তাবড় ধনকুবেরদের এবং তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ বাহান্ন বিলিয়ন ডলার দাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতের বাজারে ব্যাপক পরিমাণে এফআইআই-এর অনুপ্রবেশ ছাড়া এ জিনিস ঘটা কিন্তু অত সহজ হতো না। নিকোলাস পিরামল, সিমেন্স, এসকর্টস প্রভৃতি সহ টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কা-আম্বানী প্রভৃতি দেশি বা যে কোন বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি পরিচালিত যে কোন কোম্পানির ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা সত্য। সুতরাং দেশি-বিদেশি

শিবপ্রসাদ মিত্র

একচেটিয়া পুঁজির প্রকাশ্য দালালরা 'সেনসেক্স-এর বৃদ্ধিকে' দেশের সঠিক প্রগতি, অগ্রগতি এবং উন্নতি বলেই চালাতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের এই ফূর্তির দিনেও কেন তাদের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যাচ্ছে আতঙ্কের এক চোরা ঠাণ্ডা স্রোত? বাইরে আনন্দ আনন্দ ভাব দেখালেও নিজেদের মধ্যে কেন তারা ফিসফিস করে আলোচনা করছেন এক অতল সংকটের সম্ভাবনা? আসলে পুঁজিবাদের মজা এমনই যে

সংকট যখন আসে তখন তা শুধু শ্রমিক-কৃষক সহ ব্যাপক সাধারণ জনগণের ওপরই নেমে আসে না, তা নেমে আসে খোদ পুঁজিবাদের সাধারণ ভিত্তির ওপরও। গোটা সমাজ জুড়ে ঘনিয়ে আসা সংকটের এই কালো মেঘ পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীদের মধ্যে কেন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তার একটা ছবি দু-চার কথায় এবার আমরা দেখার চেষ্টা করি।

সেনসেক্স লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে খোদ ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রক থেকে বার বার হুঁসিয়ারী দেওয়া শুরু হয় শেয়ার বাজারে ছোট ও মাঝারী লগ্নিকারী অসংখ্য সাধারণ মানুষ যেন এই সময় শেয়ার বাজার থেকে দূরে থাকেন। অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমও একই কথা বলেন। কারণ হিসাবে বলা হয় যে এইসময় বাজার ভীষণ অনিশ্চিত। প্রচুর লাভের সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি আছে প্রচুর লোকসানের সম্ভাবনাও। ১৫ই অক্টোবর, সোমবার, একদিনে সেনসেক্স একধাক্কায় ১,০০০ পয়েন্ট বেড়ে যায়। মুম্বাই শেয়ার বাজারের লেনদেনে সর্বমোট লাভ হয় ২,১০,০০০ কোটি টাকা। এই লেনদেনে অংশ নেয় অসংখ্য ছোট মাঝারি লগ্নকারীরাও অর্থাৎ সাধারণ মানুষ। কিন্তু যে বাজার একদিনে ২,১০,০০০ কোটি টাকা লাভ দিতে পারে সে বাজার একদিনে সমপরিমাণ ক্ষতিও দিতে পারে। এদিকে সেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভারত সরকারের যে সংস্থা অর্থাৎ সেবি (Stock Exehchge Board of Index সংক্ষেপে SEBI) ভারতের বাজারে এফআইআই এজেন্টদের ব্যাপকহারে পিএন-এর ব্যবহার নিয়ে আতঙ্কিত ছিল। পিএন বা পার্টিসিপেটারী নোট হল এফআইআই-এর একধরনের লেনদেনের মাধ্যম যেখানে বিদেশ থেকে যে টাকাটা আসছে সেটা কার টাকা বা তার উৎস কি তা জানা যায় না। বিদেশের বাজারে জমে থাকা এই বিপুল কালো টাকা যা পিএন-এর মাধ্যমে এফ আই আই-এর হাত ধরে ভারতের বাজারে ঢুকছে তার আসলে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। আজকে হুড়মুড়িয়ে ভারতে ঢুকছে তো কাল সামান্য বেশি লাভের সম্ভাবনা দেখলে হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকবে ব্রাজিল বা সিঙ্গাপুরের বাজারে। পেছনে ফেলে যাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া একটা অর্থনীতি। ১৫ তারিখে শেয়ার বাজারের উত্থানে আতঙ্কিত সেবির চেয়ারম্যান এম. দামোদরণ ১৬ তারিখে পিএন ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার সম্ভাবনা ঘোষণা করেন। ১৭ তারিখে এই ঘোষণার ফল ফলে এফ আই আই-এর বিপুল কালো টাকা ভারতের বাজার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ১৭ অক্টোবর বাজার খোলার আধঘণ্টার মধ্যে সেনসেক্স রেকর্ড মাত্রায় ১৭৪৩.৯৬ পয়েন্ট পড়ে যায়। ১৫ তারিখ যা লাভ করেছিল তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি হয়। অসংখ্য ছোট-মাঝারি লগ্নিকারী সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যান যার সবিস্তার রিপোর্ট এখনও আমাদের হাতে নেই, ধুলো ঝেড়ে একদিন হয়ত তা উদঘাটন করবে কোন তহলকা ডট কম। এরপর অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম শ্যম আর কুল উভয়ের মাঝখানে একটা মাঝামাঝি রাস্তা নিয়েছেন। পিএন ব্যবহার পুরোপুরি বে-আইনী করা হবে না। কিছু নিয়ম শুধু মানতে হবে। এই সিদ্ধান্তে আশ্বস্ত এফ আই আই আবার বাজারে আসতে শুরু করেছে। সেনসেক্সও বাড়ছে এবং গত ২৯ তারিখে তা ২০,০০০ পয়েন্ট স্পর্শ করেছে। কিন্তু ভারতের বাজারে এফআইআই-এর বিপুল অনুপ্রবেশ নীরবে যে এক বিরাট আগ্নেয়গিরি তৈরি করে চলেছে একদিনের একটা ঘটনা বোধহয় আমাদের দেখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে গেল।

এদিকে ভারতের বাজারে এফ আই আই- এর এই বিপুল অনুপ্রবেশ আবার অন্য সমস্যাও তৈরি করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিশেষত ডলারের প্রচুর যোগানের ফলে ডলারের দাম কমে গিয়েছে। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম বেড়ে গিয়েছে। টাকার দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য এবং পরিষেবা আউটসোর্সিং-এর বাণিজ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। আবার ভারতের বর্তমান আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি নাকি এই দুটি ব্যবসার ওপরই চরমভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং অর্থনীতিতে সিঁদুরে মেঘ ঘানিয়ে উঠছে। এই দুটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মচারী ও শ্রমিকদের মাইনে কমতে চলেছে। কাজের বোঝাও বাড়তে চলেছে। সেনসেক্সের বৃদ্ধি অর্থাৎ এফআইআই-এর বিরাট মাত্রায় অনুপ্রবেশ ভারতীয় জনজীবনকে আরও কি কি ভাবে প্রভাবিত করছে, ক্ষতিগ্রস্ত করছে আমরা তা বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছি কিন্তু এর সঙ্গে যে আমাদের দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই বরং তা ডেকে আনছে এক সর্বব্যাপী সংকট তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই লেখা আমরা শেষ করব আনন্দবাজার পত্রিকার গত ১৫ অক্টোবর তারিখের একটি রিপোর্টিং দিয়ে যেখানে ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের খিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাম্প্রতিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

আনন্দবাজারে ছোট করে এককোণে দেওয়া এই রিপোর্টিংটির হেডিংটি এইরকম—"আথিক উন্নতিই সার, দেশে খিদে কমেছে ঢের কম"। রিপোর্টিং বলছে—"দেশের আর্থিক সূচক হুহু করে চড়ছে। এই সেদিন দশহাজার ছাপিয়ে শেয়ার সূচক এখন বিশ হাজার পার করার মুখে। আর্থিক বৃদ্ধির হারে গোটা বিশ্বে ভারত এখন দু'নম্বরে। এখন অর্থনীতির এই সুফল মাটিতে নামতে কতটুকু? অবস্থাটা পাকিস্তানে বা চিনের থেকেও ঢের খারাপ"। রিপোর্টিং আরও জানাচ্ছে—"খিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১১৮টি দেশের মধ্যে ভারত ৯৪ নম্বরে...ভারতে এখন খিদে সূচক ২৫.০৩।" রিপোর্টিং থেকেই দেখছি—"ভাল এগিয়েছে ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবা... তাদের খিদে সূচক বর্তমানে ২.২।"

আন্তর্জাতিক পুঁজির চোখে কিউবা বিপজ্জনক দেশ। সুতরাং যে দেশে এফআইআই ঢোকে না। বরং উল্টে আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধ চলে সব সময়ে। এরপরে তো আর একটি কথাই শুধু লেখা যায়। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

☛ ১ পৃষ্ঠার পর

আবার রক্তাক্ত নন্দীগ্রাম

লড়াই ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। আজ থেকে ১১ মাস আগে নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব করার বিষয়ে সালিমদের সাথে রাজ্যসরকার চুক্তি করে। জানুয়ারি মাসে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নোটিশ জারী করার পর ফুঁসে ওঠে গোটা নন্দীগ্রামের মানুষ। 'সেজ' প্রকল্পের অন্তর্গত কেমিক্যাল হাব করার বিষয়ে সোচ্চার হয় নন্দীগ্রামের গ্রামবাসীরা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। রাষ্ট্র ও প্রধান শাসক দলের বিরুদ্ধে লাগাতার সংঘর্ষ করে রাজ্য সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করে নন্দীগ্রামের মানুষ। এর জন্য বহু মূল্যও তারা দিয়েছে। 'সেজ'-বিরোধী লড়াইয়ে— জবরদস্তি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে নন্দীগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন কর্মসূচীর হাত ধরে গোটা দেশে 'সেজ' গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা শাসকশ্রেণী নিয়েছে, নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ সংগ্রাম সেই কর্মসূচীকে কিছুটা হলেও পিছু হটাতে বাধ্য করে। অপরদিকে সিঙ্গুরের পথ ধরে নন্দীগ্রামের কৃষকসংগ্রাম এ-রাজ্যে প্রধান শাসকদল সিপিআই(এম)-কে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে। সিপিআই(এম) দলের সমস্ত প্রচারই ভ্রান্ত বলে মনে করতে শুরু করেছে রাজ্যের বেশীরভাগ গণতান্ত্রিক মানুষ। এদিকে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। নন্দীগ্রামের সংগ্রাম বেঁচে থাকলে সামনে সমূহ বিপদ। তাই একে ধ্বংস করো! একদিকে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা করো। অপরদিকে ডাকাত-গুন্ডা সংগঠিত করে ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে বলপ্রয়োগ করে বুঝিয়ে 'আমার কেমন ক্ষমতা'!

দুটো উদ্দেশ্য রাজ্যের শাসকদল সিপিআই(এম) নন্দীগ্রামে এই ফ্যাসিস্ত হামলা নামিয়ে এনেছে। প্রথমত, দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছে তারা এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ণ কর্মসূচী রূপায়িত করতে, প্রয়োজনে তারা কতো কঠোর হতে পারে। দ্বিতীয়ত, গোটা রাজ্যের সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে এই আতঙ্কও তারা জনমানসে ছড়িয়ে দিতে চায়, যে সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধাচরণ করলে তার পরিণাম কি হতে পারে। আর তাই, এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের পরও তার পক্ষে যুক্তি সাজাতে তারা পিছপা হচ্ছে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে সমস্ত কিছু অত্যাচারী শাসকরা এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে। কিন্তু তারা ভাবে এক, হয়ে যায় আর এক! আর তাই, এই বর্বরতা দেখে ভয় পাওয়ার বদলে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ আরো জোরালো হয়ে উঠেছে গোটা রাজ্যে। স্বৈরাচারি ফ্যাসিস্ত শক্তির চেয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। একটা নন্দীগ্রামের লড়াই দেখে প্রতিবাদী মানুষ বহুদিনের জড়তা, কুণ্ঠা ফেলে রাস্তায় নামছে। সমাজের আনাচে-কানাচে আপনাদের অগোচরে ঘটে চলা এই 'নতুন সূর্যোদয়'-এর খোঁজ রাখছেন তো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী?

Declaration No. 178/04; 18.11.04

নেপালে সরকার ছাড়লো মাওবাদীরা : ঘটনার গতি কোনদিকে

শরিফুল ইসলাম

অবশেষে বহু জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নেপালের বর্তমান 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করলো সেখানের 'মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি'। ১২ আগস্ট, কাঠমাণ্ডুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন পার্টির চেয়ারম্যান কমঃ প্রচণ্ড। তার আগে, ৩-৮ আগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। ৬ দিনের এই দীর্ঘ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন সর্বমোট ২১৭৪ জন প্রতিনিধি। ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিষয়টি নিয়ে যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যরা ছাড়াও আমন্ত্রণ করা হয় নেপালের প্রতিটি জেলার জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্যদের, গণমুক্তি ফৌজের প্রত্যেকটি শাখার সম্পাদকদের এবং প্রতিটি বিপ্লবী গণসংগঠনের কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের। ৭৫টি জেলার পার্টি সংগঠনের ১৬৭২ জন প্রতিনিধি, গণমুক্তি ফৌজের ৭টি ডিভিশনের ৪৫৫ জন প্রতিনিধি, ভারত থেকে আমন্ত্রিত ৪০ জন প্রতিনিধি, ইউরোপের ৫ জন এবং হংকং-এর ২ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় সরকার থেকে বেরিয়ে আসার এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

বিগত ২০০৬-এ, নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মাওবাদীরা অংশগ্রহণ করার পর থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া-র জন্ম হয়। কেউ কেউ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানান এই বলে যে, নেপালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মাওবাদীরা সঠিক কৌশল গ্রহণ করেছে। কোনও কোনও শিবির আবার সরকারে যোগদানের এই ঘটনাকে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি হিসাবে অভিহিত করেন; গণআন্দোলনের পথ থেকে সরে এসে সরকারি গদির প্রতি মোহ হিসাবে পদক্ষেপটিকে বর্ণনা করেন। আমাদের দেশে বিশেষতঃ আমাদের রাজ্যে, অনেকেই নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির এই পদক্ষেপটি সিপিএম-এর বিবর্তনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে শুরু করেন। গণআন্দোলনের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতায় এসেও ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট হয়ে ১৯৭৭ পরবর্তী বামফ্রন্ট সরকারের অংশ হিসাবে সিপিএম যেভাবে ধীরে ধীরে সংগ্রামী জনতার প্রতিনিধি থেকে মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হয়েছে, নেপালের মাওবাদীদের কপালেও সেই একই ভবিতব্য লেখা আছে কিনা, সে প্রশ্নেও তীব্র সংশয় তৈরি হয় বিভিন্ন মহলে। এরই পাশাপাশি, ভারতবর্ষ সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম, নেপালী মাওবাদীদের তৎকালীন পদক্ষেপকে জোর গলায় সাধুবাদ জানাতে আরম্ভ করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। যদিও এই সমর্থনের পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই ভিন্ন। তারা ভেবেছিল, একবার সরকারি ক্ষমতায় আসীন হলে মাওবাদীরা আপন নিয়মেই সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসবে, জঙ্গী আন্দোলনের বদলে তারা আটক পড়বে সংসদীয় রাজনীতির নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে। আনন্দবাজার, 'ইকনমিক্স টাইমস্'-এর মতো প্রথম সারির বুর্জোয়া পত্রিকা এনিয়ে তাদের সম্পাদকীয় কলমে খোলাখুলি মন্তব্যও করে। বিভ্রান্তিকর সেই সময়ে 'শ্রমিকশক্তি' পত্রিকা আর পাঠকবর্গকে একদিকে যেমন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছিল, তেমনই আস্থা রাখার আবেদন জানিয়েছিল নেপালের মাওবাদীদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ওপর। 'নীতিতে দৃঢ় থেকেও কৌশলে নমনীয় হওয়ার' যে চমৎকার উদাহরণ ইতিপূর্বে নেপালের মাওবাদীরা বারংবার রেখেছেন, তাকে বিশ্লেষণ করেই 'শ্রমিকশক্তি' পত্রিকা নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন পদক্ষেপের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে, তাকে অভিনন্দন জানায়।

বিগত সেই ঘটনালীর পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান পদক্ষেপটিকে এবার বিশ্লেষণ করবো। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা মাথায় রাখতে হবে, নেপালী জনগণের বুকের ওপর পাথরের মতো চেপে বসে থাকা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তথা গণতন্ত্রের সম্প্রসারণকেই মাওবাদীরা তাঁদের আশু কর্মসূচী হিসাবে বরাবর সামনে রেখে এসেছেন। নীতিগত এই অবস্থানে সুদৃঢ় থেকে বিগত দেড় দশক ধরে তাঁরা বেশ কয়েকবার রণকৌশল বদল করেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, প্রতিটি পরিবর্তিত রণকৌশলই তাঁদের সাংগঠনিক প্রভাবকে বাড়াতে সাহায্য করেছে। রাজতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের প্রধান শক্তি হিসাবে জনমানসে বেশি বেশি করে তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। '৯০ দশকের শুরুতে উত্তাল এক গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আজকের এই মাওবাদীরা, সুবিধাবাদী সংস্কারপন্থী পার্টিনেতৃত্বদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেন। গড়ে তোলেন নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠন। অতঃপর, মেহনতী মানুষের 'সংযুক্ত গণফ্রন্ট' গড়ে তুলে আইনী কাঠামোর মধ্যেই দেশজোড়া গণআন্দোলনের এক পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে তাঁর সফল হন। গণআন্দোলনের ধাক্কায় এইসময়ই প্রথমবারের জন্য রাজপরিবার বাধ্য হয়ে দেশে সংসদীয় নির্বাচন ঘোষণা করে। গণআন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে মাওবাদীরা তৎকালীন সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কৌশল গ্রহণ করেন। শুরু হয় সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামের সাথে সংসদীয় সংগ্রামকে সমন্বিত করার এক পর্যায়। তখনকার সেই রণকৌশল যে কতটা কার্যকরী হয়েছিল, পার্টি চেয়ারম্যান কমঃ প্রচণ্ড-এর বক্তব্যেই তা স্পষ্ট। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সংসদীয় এই লড়াই, পার্টির বিপ্লবী আদর্শ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'' (দা ওয়ার্কার, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ২১)। কিন্তু সংসদের মধ্যে লড়াইয়ের সুযোগ ক্রমশঃ কমতে থাকায় মাওবাদীরাও দ্রুত তাঁদের কৌশল পরিবর্তন করেন। সংসদীয় পিছুটানকে হেলায় অগ্রাহ্য করে '৯৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে দেশজোড়া সশস্ত্র জনযুদ্ধের ডাক দেন তাঁরা। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এক দীর্ঘ পর্যায়। ১৯৯৬ থেকে ২০০৬, এই দশ বছরের এক মরনপণ লড়াইয়ের পর অবশেষে পিছু হটে রাজতন্ত্র। রাজার ক্ষমতাকে বহুলাংশে খর্ব করে নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সাতটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মাওবাদীরাও সেই সরকারে অংশগ্রহণ করে। তবে শর্তসাপেক্ষে। কি ছিল সেই শর্তগুলো? আজ যখন সরকার থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাওবাদীরা আবারও গণআন্দোলনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন নতুন করে একবার সেই শর্তগুলো আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন।

সরকারে অংশগ্রহণের প্রাক্‌কালে নেপালের প্রধান সাতটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দফায় দফায় বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসেন মাওবাদীরা। নভেম্বর '০৫ থেকে জুন '০৬ এই সময়পর্বে উভয়পক্ষের মধ্যে তিনটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিগুলি যথাক্রমে '১২ দফা বোঝাপড়া' (নভেম্বর ২০০৫), '২৫ দফা আচরণ বিধি' (মে'০৬) এবং '৮ দফা চুক্তি' (জুন '০৬) নামে পরিচিত। এই '১২ দফা বোঝাপড়া'-র ৩নং পয়েন্টটি খেয়াল করলে দেখা যাবে তাতে লেখা হয়েছিল, ''আজ, সশস্ত্র সংঘর্ষের ইতিবাচক সমাধান করে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করাটাই সমগ্র দেশের দাবী। সুতরাং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং (তার সঙ্গে) সশস্ত্র সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রতিনিধিমূলক সংসদীয় নির্বাচন এবং আগামী রাজনৈতিক পদক্ষেপ মারফৎ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। নতুন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে যে বোঝাপড়ায় আমরা পৌঁছালাম তা হল, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় নির্বাচন আহ্বান করার পর্যায়ে মাওবাদী সশস্ত্র বাহিনী এবং রয়াল নেপাল আর্মি উভয়েই রাষ্ট্রসংঘ বা অন্য কোন নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থার নজরদারীতে থাকবে—যাতে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন সংগঠিত করে তার ফলাফল গ্রহণ করা যায়।''

স্পষ্টতই, মাওবাদীদের দিক থেকে সরকারে যোগ দেওয়ার প্রধান শর্তছিল রাজতন্ত্রের অবসান। এবং নেপালকে একটি 'প্রজাতান্ত্রিক দেশ' (রিপাবলিক) হিসাবে ঘোষণা করার মধ্যে দিয়েই সরকারিভাবে রাজতন্ত্রের পূর্ণ অবসান সম্ভব। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, নানান কায়েমী স্বার্থের টানে কিছু রাজনৈতিক দল, মূলতঃ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালার নেতৃত্বাধীন নেপাল কংগ্রেস রাজতন্ত্রের পূর্ণ অবসানে মোটেই আগ্রহী নয়। ফলে এখনই নেপালে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে তাঁরা গররাজী। সরকার থেকে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হলেও 'স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে' যেভাবে নির্বাচন আহ্বান করার বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল, এককথায় তা লঙ্ঘিত হল।

এখানেই মাওবাদীদের আপত্তি। প্রথমতঃ তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, রাজতন্ত্রের নিষ্পেশন থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি পেতে নেপালের মেহনতী জনতা কতটা উন্মুখ। তাঁরা এ'ও জানেন, বহু রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে নেপালের আপামর জনসাধারণ রাজতন্ত্র বিরোধী লড়াইয়ের প্রধানতম শক্তি হিসাবে তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই স্বীকৃতিকে মর্যাদা দিয়েই এমন কোনও প্রকল্পে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা মাওবাদীদের পক্ষে সম্ভব নয়, যা প্রকারন্তরে রাজতন্ত্রের অবসান না ঘটিয়ে তাকে জিইয়ে রাখছে। দ্বিতীয়ত, সরকারিভাবে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মানেই (এমনকি তার ক্ষমতা বহুলাংশে কাট-ছাঁট করার পরেও) রাষ্ট্রক্ষমতায়, বিশেষত, সেনাবাহিনীতে তাকে প্রভাব খাটানোর ছাড়পত্র দেওয়া। নির্বাচনের আগে, রয়াল নেপাল আর্মিতে রাজার প্রভাব যদি নিশ্চিহ্ন করা না যায়, তবে নির্বাচনের সময় গা-জোয়ারী, কারচুপি, শক্তি প্রদর্শনের খেলা চলবেই—অবাধ তথা স্বচ্ছ নির্বাচন কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। তৃতীয়ত, মাওবাদীরা সরকারে থাকা সত্ত্বেও সেই সরকার কেন এখনই দেশে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করছে না, এই প্রশ্ন ক্রমশই দেশের সংগ্রামী মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির জন্ম দেবে। চতুর্থত, মাওবাদীরা যোগ দেওয়ায় অন্তবর্তীকালীন সরকারের ওপরেও দেশের মেহনতী তথা নিপীড়িত মানুষের প্রত্যাশা চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। এদিকে পাঁচমেশালী মিলিঝুলি সরকারের অনেকেই (বিশেষত, নেপালী কংগ্রেস) আবার কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি। ফলে যতদিন না নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিনই সরকারের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার দায়ভার মাওবাদীদেরও বহন করতে হবে—যা তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সঙ্গে বেমানান। ফলে প্রাথমিকভাবে যা মনে হচ্ছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্রব ত্যাগ করে এই মুহূর্তে মাওবাদীরা সঠিক কাজই করেছেন। নিজেদের ভাবমূর্তি অটুট রাখার পাশাপাশি সংগ্রামের ঝাণ্ডাকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে ঐছাড়া যে অন্যকিছু করার ছিল না, তা মাওবাদী-দের নিজেদের বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার। ১২ আগস্ট-এর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কমঃ প্রচণ্ড জানাচ্ছেন ''অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি শর্ত অনুযায়ী চলার নিশ্চিয়তা না দেয়, সন্ত্রাস বন্ধের নিশ্চয়তা না দেয়, প্রজাতন্ত্র ঘোষণা মারফৎ প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের পথ সুগম না করে তথা নির্বাচনের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্রের ষড়যন্ত্র বন্ধ করার চেষ্টা না করে, মাধেশ-এর ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, নিখোঁজ নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ না করে, পক্ষপাতিত্বহীনভাবে শহিদ পরিবারগুলির মধ্যে ত্রাণ বন্টনের কাজ না করে, অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান মোতাবেক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভূমি সংস্কার কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে না যায়, হত্যাকাণ্ড ষড়যন্ত্র এবং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস থামাতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এবং গণমুক্তি ফৌজকে যদি যথাযথ মর্যাদা না দেয়, তবে সরকার ছেড়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সামনে বিকল্প কোনও পথ খোলা থাকে না''।

সংক্ষেপে, গতবছরের বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও এইমুহূর্তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাটাই যুক্তিযুক্ত—এমনটাই মনে করছে নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। তাঁদের এই অবস্থান আপাতভাবে বর্তমান লেখকদের সঠিক বলে মনে হচ্ছে। নিজেদের লড়াকু ভাবমূর্তির পাশাপাশি গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করে সরকারকে চাপে ফেলার এই কৌশল কার্যকরী হোক, নেপালী জনতার আশা-আকাঙ্খার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব ঘটুক কমঃ প্রচণ্ডদের পদক্ষেপের মাধ্যমে—এমনটাই আমরা আশা করব।

☛ ১ পৃষ্ঠার পর

নতুন মাত্রা পেল জমির লড়াই

আজকের এসব ব্যাখ্যা তখন অতলে তলিয়ে যাবে। তাই তো আমরা এই আইন সংশোধন বা পরিমার্জন নয়—এর বাতিলের পক্ষে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এত কিছু পারে অথচ একটা ব্রিটিশ আইনকে বাতিল করে জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে নতুন আইন, নতুন গাইড লাইন তৈরীর নির্দেশ দিতে পারে না?

আমরা কেন বলছি সুপ্রীম কোর্টের এই রায় সদর্থক হয়েও স্ববিরোধিতায় ভরা, কেন আমরা বলছি যে গণআন্দোলনের চাপ থাকলেই কেবল আমরা এই রায়কে আমাদের রসদ হিসেবে কাজে লাগাতে পারবো, তা এই রায়ের পরবর্তী অংশের আলোচনায় গেলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই রায়ে বলা হচ্ছে—''যখনই কোনো কোম্পানি সরকারের কাছে কোনো জমি অধিগ্রহণের জন্য আবেদন জানাবে, সরকার তখন কালেক্টরকে তলব করবে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য। কালেক্টরকে ঐ রিপোর্টে যে যে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে হবে তা হল—

১) অধিগ্রহণের জন্য ঐ অঞ্চলে জমি চিহ্নিত করতে কোম্পানি সর্বোচ্চ বিবেচনা দেখিয়েছে কিনা।

২) যদি কোনো জমি কিনতে কোম্পানি ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে সেই জমির মালিককে উচিত দাম দিয়ে জমি কেনার ব্যাপারে কোম্পানি যথাযথ উদ্যোগ দেখিয়েছে কিনা।

৩) প্রস্তাবিত জমি কোম্পানির নির্ধারিত প্রকল্পের জন্য যথোপযুক্ত কিনা।

৪) চিহ্নিত জমির আয়তন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনা।

৫) কোম্পানি ঐ জমিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে কিনা।

৬) যেখানে চিহ্নিত জমিটি 'ভালো কৃষিজমি' সেখানে ঐ জমি না নিয়ে বিকল্প কোন জমি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

ঐ রায়ে আরও বলা হল, ''চিহ্নিত জমিটি কৃষিজমি হলে সংশ্লিষ্ট কালেক্টরকে জেলার সিনিয়র এগ্রিকালচারাল অফিসার-এর থেকে জানতে হবে যে ঐ জমি 'ভালো কৃষিজমি' কিনা। তারপর কালেক্টরকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হিসাব কষে বের করতে হবে এবং খতিয়ে দেখতে হবে যে কোম্পানি যথাযথ পরিমান ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে কিনা....''

স্ববিরোধগুলো বোঝা গেল কি? যে রায়ে একদিকে বলা হল 'ভালো কৃষিজমি' নেওয়া যাবে না, তারই ল্যাজ ধরে অনেক 'কিন্তু' করে তারই ক্ষতিপূরণের হিসেব কষতে বলা হল কালেক্টরকে! দেখতে বলা হল যে কোম্পানি সঠিক 'ক্ষতিপূরণ' দিচ্ছে কিনা!

জমি অধিগ্রহণ—তা কখনো 'সেজ' গঠনের নামে, কখনো বা শিল্পস্থাপনের নামে অবাধ গতিতেই দেশজুড়ে চলছে। অসংখ্য প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এই বিতর্ককে তীব্রতর করেছে—নন্দীগ্রামের মতো কোথাও কোথাও জনগণের লড়াই এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আটকে দিলেও সামগ্রিকভাবে মালিকী স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ অব্যাহতই আছে। সুপ্রীম কোর্ট দেশজুড়ে চলা এই লড়াইগুলোর চাপের মুখে দাঁড়িয়েই এই রায় দিয়েছে, নয়া ব্যাখ্যা হাজির করেছে জমি অধিগ্রহণ আইনের গাইডলাইন তৈরি করেছে যাতে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় মালিকী স্বার্থের আগ্রাসীরূপ প্রকট না হয়ে ওঠে।

এই রায়কে ধরে যদি আমরা সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে দেখি, তাহলে নিঃসন্দেহে সেই জমি অধিগ্রহণ বেআইনী। সিঙ্গুরের আন্দোলন এর থেকে নতুন রসদ পেতে পারে। আবার এটাও সত্যিই যে এই রায়ের ফাঁকগুলো দিয়ে গলে যেতে পারে মালিকী স্বার্থের নখ-দাঁত। কোনো সরকার চাইলে তার পক্ষের পেশীবল-প্রশাসন-পুলিশ-ক্যাডারকে কাজে লাগিয়ে সহজেই দিনকে রাত করতে পারে—বলতে পারে যে সব শর্ত পূরণ হচ্ছেই তো! সিঙ্গুরের বেলায় এসব অপযুক্তি আমরা খুব দেখেছি।

অতঃপর আমাদের সামনে কাজটা সুস্পষ্ট—আন্দোলন তীব্রতর হলেই এই রায় কার্যকরীভাবে প্রয়োগ হতে পারে। আর তা না হলে এই রায় জমি লুণ্ঠনের ভয়াবহ প্রক্রিয়াকে 'মানবিক' রূপ দেবে মাত্র। তাই রাশ আলগা করার ফুরসত নেই এখন।

সত্ত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : অমৃত পৈড়া